নববোধন।

(উপন্যাস)

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সানুবাদ

অভিধান চিন্তামণি।

(হেমচন্দ্র কোষ)

মূল্য ১৷৹ টাকা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ

কলিকাতা।

১৯ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্তীর লেন,

বীণাপাণি প্রেসে

শ্রীচতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

এবং

১৮৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, "স্বদেশী" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীচতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় করকমলেষু।

প্রিয় শচীশ বাবু, ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ফুল কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া যে ক্ষুদ্র মালাটী গাঁথিয়াছি, তাহা আপনারই কণ্ঠে পরাইয়া দিলাম। এ গন্ধহীন ফুলের মালা অন্যের নিকট অকিঞ্চিৎকর হইলেও আপনি ইহা ফেলিতে পারিবেন না। কেন না ইহার মালাকর—

আপনার

নারায়ণ।

বিজ্ঞাপন।

গল্পগুলি একবার 'প্রবাহ' 'স্বদেশী' 'জাহ্নবী' প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেইগুলি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

অধুনা বঙ্গসাহিত্যে গল্প বা উপন্যাসের অভাব নাই, থাকিলেও সে অভাব দূরীকরণ আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল 'বোঝার উপর শাকের আটি' চাপাইয়া দিলাম মাত্র। ভরসা করি, ইহাতে বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ভারগ্রস্ত হইবে না।

গল্পগুলি প্রথম যখন মাসিকে বাহির হয়, তখন অনেকেরই নিকট বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলাম। তজ্জন্যই সে গুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। ইতি

কলিকাতা।
কার্ত্তিক, ১৩১৪ সাল। } শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

—(•)—

কথা-কুঞ্জ।

মহামায়া।

(১)

সিদ্ধেশ্বর সংসারের উপর হাড়ে চটা। অনেক কষ্টে এফ্‌ এ পাশ করিয়া সে যখন দেশে আসিয়া বসিল, তখন দেশের অনেকগুলি লোক তাহাকে আশার কত উচ্চ সোপান দেখাইল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, সিদ্ধেশ্বর কালে একজন বড় লোক হইবেই হইবে। তাহাদের মধ্যে গ্রামের একজন মাতব্বর বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, এমন ছেলে বাঁচলে হয়। গ্রামবাসিগণের মুখে এই সকল ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়া শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরও আপনাকে সাধারণের অপেক্ষা আরও অনেক উচ্চে তুলিল। তাহার সম্মুখে

কল্পনার অনন্ত ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িল। সেই বিশাল ক্ষেত্রে কত সোণালী ছবি ফুটিয়া উঠিল; কত অপ্সরাকুল-পরিবৃত নন্দনকানন একে একে ভাসিয়া গেল, কত আশার মোহিনী মূর্ত্তি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। সিদ্ধেশ্বর সেই সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া, আশার চঞ্চলমূর্ত্তি লক্ষ্য করিতে করিতে দিন কাটাইতে লাগিল।

এক এক করিয়া অনেকগুলি দিন কাটিল, কিন্তু সিদ্ধেশ্বর বড়লোক হইল না। সে যেমন, ঠিক তেমনই রহিল। বাড়িবার মধ্যে জঠরানলের প্রতাপটা কিছু বাড়িল, এবং সেই বৃদ্ধিতে তাহাকে কিছু ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। তখন সিদ্ধেশ্বর দেশের লোকের ভবিষ্যৎ বাণীর মুণ্ডপাত করিতে করিতে উদরান্ন সংস্থানের চেষ্টায় বাহির হইল।

কিন্তু বাহির হইয়াও সিদ্ধেশ্বর গতিক বড় ভাল বুঝিল না। সে দেখিল, জগৎ কেবল স্বার্থপর। সকলেই আপন আপন স্বার্থের জন্য, উন্নতির জন্য ব্যস্ত। কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহে না, কেহ কাহারও দুঃখ বুঝে না; বা বুঝিলেও সহানুভূতিসূচক একটু আহাও করে না। সে যে এত করিয়া এত লোকের সাধ্য সাধনা করিল, এত দুঃখের কাহিনী শুনাইল, তথাপ কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না, তাহার অন্নের সংস্থানটুকু পর্য্যন্ত করিয়া দিল না।

দেখিয়া শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। পরিণামে তাহাদের কি হইবে ইহাই ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের মঙ্গল (!) কামনা করতঃ সে আবার দেশে ফিরিল।

দেশে ফিরিয়া সিদ্ধেশ্বর এবার চাকরীর জন্য নারিকেল-বৃক্ষপত্র-সম্ভূত কোনও বস্তু বিশেষের আহারের ব্যবস্থা করিয়া স্বাধীন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে মনস্থ করিল। সে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিত, তখন হইতেই নাটক নভেলের উপর তাহার প্রখর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। স্বয়ংও মধ্যে মধ্যে দুই একটা শোকোচ্ছ্বাস আনন্দোচ্ছ্বাস প্রভৃতি লিখিয়া ক্লাসের ছাত্রগণকে স্তম্ভিত করিত এবং চেষ্টা করিলে সে যে কালে মাইকেলের ন্যায় একজন উচ্চদরের প্রসিদ্ধ কবি হইতে পারিবে, তাহাদের মুখে এরূপ আশ্বাসও পাইত। এখন সময় বুঝিয়া সিদ্ধেশ্বর সেই সুপ্তপ্রতিভাকে জাগাইতে চেষ্টা করিল। সভক্তি অন্তরে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া প্রতিভাদেবীকে আহ্বান করিল। তাহার সেই সকাতর আহ্বানে প্রতিভা দেবী জাগিয়া উঠিয়া তাহার সম্মুখে সশরীরে বা অশরীরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন কিনা, তাহার বিশেষ সংবাদ রাখি না, কিন্তু সে জন্য সিদ্ধেশ্বরের চঞ্চল লেখনী বিরত হইল না। তাহার অঙ্গুলিতাড়নায় ক্ষুদ্র

লেখনী অনেকগুলি কাব্য নাটক উদ্গীরণ করিল। তখন প্রফুল্লচিত্তে সিদ্ধেশ্বর তাহাদের সদ্গতির জন্য চেষ্টিত হইল। কিন্তু বলিতে বুক ফাটিয়া যায় রে! দুর্ভাগ্য দেশে কেহই সেই অমূল্য (!) পুস্তক রাশির মর্ম্মগ্রহণে বা গুণগ্রহণে সমর্থ হইল না। হায়! সংসারের এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহারে— এইরূপ অনাদরের আওতায় পড়িয়া কত প্রতিভার কোমল অঙ্কুর একবার দেখা দিয়াই মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে! ধিক্ এ সংসারে! এবার সিদ্ধেশ্বর ক্রোধান্ধ হইয়া সংসারের ঊর্দ্ধ বায়ার পুরুষের কোনও ভয়ঙ্কর স্থানে গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া লেখনা সহিত প্রতিভোথিত সেই অমূল্য পুস্তকরাশি দ্বারকেশ্বর নদকে উৎসর্গ করিয়া দিল।

তা' আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, যদি জঠরাগ্নির কোনও রূপ পীড়ন না থাকিত, তাহা হইলে ক্রোধান্ধ সিদ্ধেশ্বর কখনই প্রতিবাসিদিগের দ্বারস্থ হইয়া, সেই অহরহঃ প্রজ্বলিত অনলের নির্ব্বাণোপায়ের পরামর্শ লইতে যাইত না, এবং দুই বেলা তথায় যাতায়াত করিয়া, পরামর্শের পরিবর্ত্তে রামরাম বাবুর জমিদারীর আয় ব্যয়ের বিস্তৃত সমালোচনা শুনিয়া হতাশ চিত্তে ফিরিয়া আসিত না।

কোন দিকে কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে সিদ্ধেশ্বর বিধাতার শরণাপন্ন হইল। কিন্তু স্থবির বিধাতা তখন

ঊনপঞ্চাশৎ-মারুতান্দোলিত টল্‌টলায়মান কমলটীর উপর বসিয়া আপনার পরকালের আশ্রয়চিন্তায় নিমগ্ন। কাজেই সিদ্ধেশ্বর তথা হইতে পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যাত হইল।

মনুষ্য-হৃদয় কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে। সিদ্ধেশ্বর সংসারের উপুর হাড়ে চটিয়া গেল।

(২)

তা' সিদ্ধেশ্বরের অবস্থা যে চিরদিনই এইরূপ ছিল তাহা নহে। তাহার পিতা নরহরি মুখোপাধ্যায় উদয়গঞ্জ গ্রামের মধ্যে একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত না এমন লোক সে গ্রামে ছিল না বলিলেই হয়। গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রাভদ্র তাঁহার প্রতিপাল্য ছিল। অনেকেই কোন না কোন সময়ে তাঁহার নিকট অল্পাধিক সাহায্য পাইয়াছিল। তিনি জমিদার রামরাম বাবুর সরকারে নায়েবী করিতেন। এই আয়ে তিনি তাঁহার মাটীর গৃহখানিকে অট্টালিকায় পরিণত করিয়াছিলেন। দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপেও বেশ দশ টাকা খরচ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। কালক্রমে তিনি কাল বিসূচিকা রোগে হঠাৎ পরলোকগত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলাও অন্তর্হিতা হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরই জমিদার মহাশয় তাঁহার নামে চারি হাজার

টাকার তহবিল তছরুপাতের দাবী করিলেন, এবং আদালত হইতে ডিক্রী পাইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি—মায় ভদ্রাসন খানি পর্য্যন্ত নীলামে চড়াইয়া ডাকিয়া লইলেন। যদি কেহ অভিভাবক থাকিত, তাহা হইলে জমিদার এই মিথ্যা মোকদ্দমায় ডিক্রী পাইত কিনা সন্দেহ, ডিক্রী পাইলেও দাবীর চারি হাজার টাকা পরিশোধ করিয়াও তাঁহার যথেষ্ট সম্পত্তি থাকিত। কিন্তু তাঁহার নাবালক পুত্রের হইয়া কে দেখিবে? জমিদার দশ হাজার টাকার সম্পত্তি দুই হাজার টাকায় ডাকিয়া লইলেন। গ্রামের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই অল্পমূল্যে দুই একটা সম্পত্তি কিনিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা স্ত্রী নাবালক সিদ্ধেশ্বরের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী হইতে বাহির হইলেন। আপনার যে যৎকিঞ্চিৎ স্ত্রীধন ও অলঙ্কার ছিল, তদ্দ্বারা একখানি খড়ুয়া গৃহ খরিদ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং কষ্টেস্লষ্টে সংসার চালাইয়া সিদ্ধেশ্বরকে পড়াইতে থাকিলেন।

ক্রমে দুইবার ফেল হইয়া সিদ্ধেশ্বর এফ এ পাশ করিল। বিধবার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি এইবার পুত্রকে সংসারী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পুত্রবধূ

ও পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া পরকালে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবার আশায় দিন গণিতে থাকিলেন।

তাঁহার আশা পূরণের এমন কোন বাধাও ছিল না। অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার দ্বারে আসিয়া অতিথি হইতে লাগিল। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর ইহাতে বড়ই নারাজ। তাহার প্রতিজ্ঞা, সে দশজনের একজন না হইয়া বিবাহ করিবে না; অকস্মাৎ এতবড় একটা গুরুভার স্কন্ধে লওয়া সে বড় সুবিধা বিবেচনা করিল না। অনেক পীড়াপীড়িতেও সে জননীর, সমাজের, আত্মীয় স্বজনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিল।

এদিকে জলের মত দিন যায়, কিন্তু সিদ্ধেশ্বরের বড়লোক হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কাল কাহারও কথা শুনিয়া চলে না। সিদ্ধেশ্বরের জননী আশা পূর্ণ না হইতেই অকস্মাৎ একদিন ইহলোক হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। সিদ্ধেশ্বরও বিবাহের অনুরোধ হইতে বাঁচিল।

(৩)

উদয়গঞ্জ গ্রামের উত্তর প্রান্তে—যেখানে বক্রগতি দারকেশ্বর পূর্ব্বমুখ ত্যাগ করিয়া, গ্রামখানিকে বেড়িয়া দক্ষিণ মুখে ছুটিয়াছে. ঠিক সেইখানে বাঁকের উপর নদের তীরে শ্মশানেশ্বরের মন্দির। মন্দির মধ্যে অনাদিলিঙ্গ| শ্মশানেশ্বর

বিরাজিত। তৎপার্শ্বেই অন্নপূর্ণার মন্দির। শ্মশানেশ্বরের মন্দিরের পশ্চাতেই নদের উপর সুবৃহৎ শ্মশান। চতুর্দ্দিকে চারি পাঁচ ক্রোশ মধ্যে এই শ্মশান প্রসিদ্ধ। অনেকেরই বিশ্বাস, এই স্থানে শবদেহ দাহ করিলে, মৃতব্যক্তি পরলোকে উত্তমা গতি প্রাপ্ত হয়। এই বিশ্বাসে অনেকে বহুদূর হইতে শব আনিয়া এখানে দাহ করে। সকলে এই স্থানকে পীঠ স্থান সদৃশ বলিয়া জানে। মধ্যে মধ্যে দুই একজন সন্ন্যাসীও এখানে আসিয়া থাকেন।

বাস্তবিক স্থানটী অতি ভয়ঙ্কর, কিন্তু অতি মনোহর। ইহার চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত লোকের বসতি নাই। এখানে দারকেশ্বর বক্রগতি, স্রোত ভয়ানক প্রখর। তাহাতে অহরহঃ একটা গম্ভীর ধ্বনি উঠিতেছে। তীরে ঝাউ পলাশশ্রেণীর মধুর ঝঙ্কার। বৃক্ষাবলী মধ্যে একদিকে জগৎপিতা দেবাদিদেবের সুউচ্চ মন্দির, অন্যদিকে জগন্মাতা অন্নপ্রদান-নিরতা অন্নপূর্ণার আনন্দময়ী মূর্ত্তি। উভয় মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট। দারকেশ্বর তাহার সোপানশ্রেণীতে মাতাপিতার উদ্দেশ্যে নিরন্তর প্রণত হইতেছে। সম্মুখেই ভীষণ শ্মশান। তাহাতে শত শত চিতাচিহ্ন। কেহ বা সদ্য নির্ব্বাপিত, কেহ বা প্রজ্বলিত, কেহ বা পুরাতন। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি অঙ্গার, অস্থিখণ্ড,

অৰ্দ্ধদগ্ধকাষ্ঠ, বংশদণ্ড, মৃৎকলস সকল অসংযত ভাবে পড়িয়া যেন কৃতান্তের প্রত্যক্ষ ক্রীড়াভূমির ভীষণ লীলা করিতেছে। চতুর্দ্দিক নীরব গম্ভীর প্রশান্ত। এই ভীষণ গম্ভীরতার মধ্যে শ্মশানেশ্বর অনন্তকাল হইতে বসিয়া কালের অনন্ত গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এখানে আসিলেই মনে ভয়-বিমিশ্রিত ভক্তির সঞ্চার হয়। সংসারের কোলাহল ক্ষণেকের জন্য নিরস্ত করিয়া, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া, কে যেন হৃদয়কে অনন্তের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

সম্প্রতি এই স্থানে একজন সন্ন্যাসী আসিলেন। সিদ্ধেশ্বর সংসারের উপর চটিয়া এই সংসারত্যাগীর নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। তারপর একদিন গভীর রজনীতে দ্বারে চাবি লাগাইয়া, লোটা কম্বল সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কোথায় চলিয়া গেল।

(৪)

ইহার তিন বৎসর পরে একদিন ভোরের সময় সিদ্ধেশ্বর একাকী আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ঘাটের উপর বসিল। প্রভাত হইলে দুই একজন প্রাচীন ব্যক্তি সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া দেখিল যে, তথায় একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, স্কন্ধে গৈরিক উত্তরীয়, মুখ-মণ্ডল অনতিদীর্ঘ সুকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজিতে আবৃত,মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

জটাজাল, হস্তে একটা কমণ্ডলু। দেখিতে দেখিতে ক্রমে সকলে চিনিল, এ সন্ন্যাসী আর কেহ নহে, তাহাদেরই সিদ্ধেশ্বর। তখন প্রাচীন রামহরি ঘোষ সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল। সিদ্ধেশ্বর অবাক্। যে ঘোষজা বুড়ো চিরকাল তাহাকে সিদ্ধ সিদ্ধ বলিয়া ডাকিয়াছে, সেই অতিবৃদ্ধ আজ ভক্তির সহিত তাহাকে প্রণাম করিল। তবে কি এই তিন বৎসরে তাহার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, সে এখন সকলেরই প্রণম্য? সিদ্ধেশ্বর আপনাতে তেমন কোন পরিবর্ত্তনই খুঁজিয়া পাইল না। সিদ্ধেশ্বর জানে যে, সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া এই তিন বৎসরের মধ্যে দুইটী বৎসর সে কেবল তাঁহার মোট বহিয়া বেড়াইয়াছিল মাত্র। তারপর একদিন সন্ন্যাসী তাহাকে নির্জ্জনে বলিয়াছিলেন, "বৎস! সন্ন্যাস ধর্ম্ম বড় কঠিন। কেবল সংসার ছাড়িয়া, কর্ম্মত্যাগ করিয়া, গৈরিক বসন ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥"

"বৎস! কর্ম্ম কর, কিন্তু কামনার ছায়াকে হৃদয়ে স্থান দিও না। এতটুকুও স্বার্থের আশা না রাখিয়া, দেহের শেষ রক্তটুকু পর্য্যন্ত দিয়া পরোপকার করিও। কামিনী কাঞ্চনের

প্রলোভন হইতে সতর্ক হইও। কামক্রোধাদি বর্জ্জন করিও। মহামায়াকে দূরে রাখিও।" সিদ্ধেশ্বর উপদেশ পালনে স্বীকৃত হইয়াছিল।

কিন্তু সেই দিন হইতেই সন্ন্যাসী নিরুদ্দেশ। সিদ্ধেশ্বর কি করিবে, কোন্ পথ অবলম্বন করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। শেষে গুরুদেবের অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। নানাস্থানে ঘুরিয়াও এই এক বৎসরের মধ্যে সে গুরুর কোন সন্ধানই পাইল না। অবশেষে খুঁজিতে খুঁজিতে জন্মভূমি উদয়গঞ্জে উপস্থিত হইয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে যে সিদ্ধেশ্বর এই ঘাটে সন্ন্যাসীর সঙ্গী হইয়াছিল, আজও সে সেই সিদ্ধেশ্বর। বেশীর ভাগ কেবল গৈরিক-রঞ্জিত বস্ত্রখানি, আর মাথায় ছোট ছোট জটাগুলি। তবে কোন গুণে সে আজ সকলের প্রণম্য হইবে?

সিদ্ধেশ্বর যদি মনস্তত্ত্ববিদ্ হইত, তবে সে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করিতে পারিত যে, অন্তরের শোভা অপেক্ষা বাহিরের শোভাই জনমুগ্ধকর। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সিদ্ধেশ্বর সে বিষয়ে পণ্ডিত নয়।

চিন্তিত অন্তঃকরণে সিদ্ধেশ্বর ঘাট হইতে উঠিয়া গ্রামের মধ্যে চলিল। পথে তাহাকে যে দেখিল, সেই প্রণাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। সিদ্ধেশ্বর আপন বাটীর সম্মুখে উপ-

স্থিত হইয়া দেখিল, গৃহটি ভগ্নপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঝড়ে খড় উড়িয়াছে, বাঁশ বাখারী প্রতিবাসিগণের চূল্লীতে স্থান পাইয়াছে, চারিদিকে আগাছার জঙ্গল জন্মিয়াছে, তালায় মরিচা ধরিয়াছে। বাটিটী এক প্রকার বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সিদ্ধেশ্বর বড়ই চিন্তিত হইল। কিন্তু এজন্য তাহাকে অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। তথায় তাহার বাসের অভিপ্রায় জানিয়া,গ্রামের চাষীবাসীরা আসিয়া এক দিনেই সেই পতনোন্মুখ গৃহখানিকে বাসযোগ্য করিয়া দিল। সিদ্ধেশ্বর মনে মনে হাসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

(৫)

সিদ্ধেশ্বরের কিছু হউক বা না হউক, পাঁচ জনে তা শুনিবে কেন? তাহারা স্থির করিল, এই তিন বৎসর সন্ন্যাসীর সঙ্গে ফিরিয়া সিদ্ধেশ্বর একজন মহাপুরুষ হইয়া আসিয়াছেন। তিনি এখন আর সাধারণ মনুষ্য নহেন, দেবতা তুল্য। তিনি মনে করিলে যোগবলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই বলিয়া দিতে পারেন। তিনি বন্ধ্যাকে পুত্রবতী করিতে পারেন; চির রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারেন; অন্ধকে চক্ষু, খঞ্জকে পদ, বধিরকে শ্রবণ, বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করিতে পারেন। তিনি আদেশ করিলে দেবতা বর্ষণ করেন, চন্দ্র সূর্য্য আকাশ ছাড়িয়া পৃথিবীতে আগমন

করেন। এমন কি, তিনি ইচ্ছা করিলে এক দিনে এক মুহূর্ত্তে উদয়গঞ্জ গ্রামখানিকে ভস্মীভূত করিতে অথবা দারকেশ্বরের জলে ডুবাইয়া দিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে আর কিছু না হইলেও সিদ্ধেশ্বর একটা দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। প্রভাত হইলেই সে দেখিত, কেহ বা চাউল, কেহ বা ডাল, কেহ বা তরকারী পয়সা প্রভৃতি আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিতেছে, এবং মহা-পুরুষ কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইলেই তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া হৃষ্টমনে ফিরিতেছে।

ক্রমে সিদ্ধেশ্বরের মহিমা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিল। প্রত্যহ কত নরনারী, বৃদ্ধা যুবতী, রোগী প্রভৃতি তাহার দ্বারে আসিয়া যোড়করে দণ্ডায়মান থাকিত। সিদ্ধেশ্বর মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, এ এক রকম মন্দ নয়, বুঝি বা পড়্তা ফিরিল।

বাস্তবিক অল্প দিনের মধ্যেই সিদ্ধেশ্বরের পড়্তা ফিরিল। বেশ দু-পয়সা সঞ্চয় হইতে থাকিল। তাহার নিরানন্দময় জীবন-স্রোতে বেশ একটু একটু করিয়া আনন্দের জোয়ার বহিতে লাগিল। কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে এক একবার তাহার মনে জাগিত, সন্ন্যাসীর সেই মহান্

উপদেশ—গুরুদেবের সেই গুরুগম্ভীর বাক্য, "কামিনী কাঞ্চনের প্রলোভন হইতে সতর্ক থাকিও।"

এইরূপে শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় সিদ্ধেশ্বরের মহিমা যখন দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তখন তাহার হৃদয়ের লুপ্ত-প্রায় অহঙ্কারটীও ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। ক্রমে সে আপন মাহাত্ম্য দেখাইতে চেষ্টিত হইল। অন্যান্য প্রভাব দেখান অপেক্ষা গণনা বিদ্যার প্রভাবটা দেখান বড়ই সহজ। সিদ্ধেশ্বর সেই সহজ বিদ্যারই অনুসরণ করিল। ব্যবসায় চলিল ভাল; কিন্তু এমন এক দিন আসিল, যখন এজন্য তাহাকে অনুতাপ করিতে হইল, এবং সেই অনুতাপাগ্নিতে আজীবন তাহাকে পুড়িয়া মরিতে হইল। কিন্তু মানব ভবিষ্যৎ-অন্ধ।

(৬)

একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নটা বড়ই প্রখর হইয়াছিল। রৌদ্রটা যেন আগুনের শিখার মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই প্রখর তাপে ভীত হইয়া পবনদেবও বুঝি গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, কেবল মাঝে মাঝে তাঁহার নিদ্রোত্থিত দীর্ঘশ্বাসগুলা এক একটা আগুনের হল্‌কার মত ছুটিয়া আসিতেছিল। গৃহস্থগণ দ্বার গবাক্ষ বন্ধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিল। পথে

একটীও জন প্রাণী নাই। আকাশ প্রান্তর গ্রাম সমস্তই যেন একটা ভীষণ নীরবতায় পূর্ণ। ঠিক সেই সময়ে এই নীরব রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনটী পথিক আসিয়া সিদ্ধেশ্বরের বাটীর দ্বারে দাঁড়াইল। পথিকদিগের তিনজনের মধ্যে দুইটী স্ত্রীলোক, একটী পুরুষ। স্ত্রীলোক দুইটী নিরাভরণা হইলেও আকৃতি দেখিয়া কোনও ভদ্রকুলোদ্ভবা বলিয়া বোধ হয়, এবং পুরুষটীকে ভৃত্য বলিয়া অনুমান হয়। স্ত্রীলোক দুইটী বিধবা। একটী যুবতী, অপরাটী প্রৌঢ়া।

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর সিদ্ধেশ্বর দরজা খুলিয়া দিলে স্ত্রীলোক দুইটী বাটীতে প্রবেশ করিল। ভৃত্য বাহিরে বসিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বর স্ত্রীলোক দুইটীকে বসাইয়া, পাঁজি পুঁথি বাহির করিয়া গণনা করিতে বসিল। প্রথমেই যুবতীর গণনা আরম্ভ হইল। অনেকেই মনে করিতে পারেন, হিন্দুর গৃহে বিধবা, তাহার আবার গণনা করিতে আছে কি? তাহার অদৃষ্টের সমস্ত অক্ষরগুলিই তো সে এক দিনে একটী ঘটনায় পাঠ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার চক্ষে তাহার ভবিষ্যৎ স্পষ্ট, সমুজ্জ্বল। সত্য কথা। কিন্তু হিন্দুবিধবার নিজের ছাড়া আরও একটা কাজ আছে। সে নিজের ভবিষ্যৎ অক্ষরগুলি এককালে পাঠ করিয়া এক্ষণে পরের ভবিষ্যৎ

দেখিবার জন্য ব্যস্ত। নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সে এখন পরের সুখ দেখিবার জন্য লালায়িত। তাহার একদিকে একটা দ্বার রুদ্ধ হইয়া অন্যদিকে শতদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। তাহার স্নেহ-মন্দাকিনী একদিকে বাধা পাইয়া অন্যদিকে শতধারে ছুটিয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র জীবনখানি এখন পরের দ্বারে উৎসৃষ্ট। যদি এ সংসারে পরের সুখে সুখী কাহাকেও দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দুবিধবার পানে। যদি পরের মঙ্গলদ্বারে আত্মসুখ বলিদান দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দু-বিধবার পানে। যদি জগতে নির্লিপ্ত ভোগ, নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দুবিধবার পানে। যদি নিরাশ প্রতিমার হৃদয়ে স্বার্থ-শূন্য আশার আলোক দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দুবিধবার পানে। যদি সংসার-কাননে যথার্থ ব্রহ্মচারিণী দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দুবিধবার পানে। হিন্দুর গৃহে যদি মূর্ত্তিমতী দেবতা দেখিতে চাও, তবে চাহিয়া দেখ ঐ হিন্দুবিধবার পানে। হিন্দুবিধবার উপমা হিন্দুবিধবা।

বিধবার মামাত ভগিনীপতির ইদানী ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসার অতীত কি একটা রোগ হইয়াছে। সে আর বড় একটা ঘরমুখো হয় না। দৈবাৎ বাটীতে আসিলেও স্ত্রীর সহিত আর তেমন ব্যবহার করে না। কেমন একটা ছাড়া

ছাড়া ভাব দেখায়। সংসার খরচের টাকা কড়িও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইতেছে। তাহার কি হইল? কি উপায়েই বা এ রোগের শান্তি হয়। তাই বিধবা, ভগিনীপতির মঙ্গলের জন্য লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া, এই দারুণ রৌদ্রে এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গণাইতে আসিয়াছে।

গণনা করিতে করিতে সিদ্ধেশ্বর একটী একটী প্রশ্ন করিতে লাগিল, বিধবা ধীরে ধীরে তাহার উত্তর দিতে থাকিল। স্বরগুলা সিদ্ধেশ্বরের কাণে বড়ই মিঠা বাজিতে লাগিল। এই কয় মাস যাবৎ তাহার কাণে অনেক রকম মিঠা কড়া স্বর বাজিয়াছে, কিন্তু এ রকম মিঠা একটাও বাজে নাই। অনেকেই জানেন, গণনা কালে উত্তরদাতার মুখের ভাব দেখিবার বড়ই প্রয়োজন হয়। সিদ্ধেশ্বর সেই ভাব দেখিবার জন্য উত্তরদাত্রীর মুখের দিকে চাহিল। আ মরি মরি! কি মুখ রে! মধ্যাহ্ন রবিকর-প্রভাসিত তরঙ্গহীন স্থির সরসীবক্ষে পূর্ণবিকশিত অচঞ্চল পদ্মের ন্যায় কি সুন্দর মুখখানি! কি গঠন! কি লালিত্য! কি সৌন্দর্য্য! সুখদুঃখহীন হর্ষবিষাদছায়া-বর্জ্জিত বালবিধবার সেই যৌবনোদ্দীপ্ত মুখশ্রী দেখিয়া দেখিয়া সিদ্ধেশ্বর আপনা হারাইল, সংযম ভুলিল, মজিল, সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিল। প্রাবৃটসম্ভূতা কুলপ্লাবিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় যৌবন-

প্লাবিতা পূর্ণায়তনা অঙ্গযষ্টি, তাহাতে স্বর্গীয় সুষমাপূর্ণ পবিত্রতার আধার অনাঘ্রাতপুষ্পবৎ সুন্দর মুখখানি, তদুপরি স্থির ধীর সমুজ্জ্বল ভাসা ভাসা চোকদুটীর সরলদৃষ্টি! মজিল রে হতভাগ্য সিদ্ধেশ্বর মজিল! উন্মত্ত পতঙ্গ প্রজ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপ দিল।

গণনায় বড় ভুল হইতে লাগিল। ভুল হইল কি ঠিক হইল, সে জ্ঞান সিদ্ধেশ্বরের নাই। যেমন তেমন করিয়া গণনা শেষ হইল। যাইবার সময় সিদ্ধেশ্বর তাহাদের পরিচয় লইয়া বিদায় দিল। পরিচয়ে জানিল, যুবতীর পিতার নাম ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী। নিবাস গোপাল নগর; যুবতীর নাম মহামায়া। নাম শুনিয়া সিদ্ধেশ্বর একবার কাঁপিয়া উঠিল।

(৭)

সিদ্ধেশ্বর এবার বড়ই গোলে পড়িল। জীবনব্যাপী অশান্তির মধ্যে সে একটু শান্তি পাইয়াছিল। প্রকৃত শান্তি না হইলেও এক রকম গোলেমালে কাটিতেছিল ভাল। কিন্তু এবার সে সেটুকুও হারাইল। ঘোর জীবন-সংগ্রামে যে একটুমাত্র রত্ন লাভ করিয়াছিল, না বুঝিয়া তাহা কোথায় ফেলিয়া দিল, আর খুঁজিয়া পাইল না। হতভাগ্য সিদ্ধেশ্বর ইহজীবনের সমস্ত সুখ শান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল অনন্ত দুঃখ—অনন্ত অশান্তির সহিত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল।

এখন আর বড় কেহ সিদ্ধেশ্বরের নিকট গণাইতে আসে না। যদি কেহ কখন আসে, সে তাহার গম্ভীর মূর্ত্তি, উদাস দৃষ্টি দেখিয়াই সরিয়া যায়। গণনা করিলেও এখন আর গণনা ঠিক হয় না, সকলই বিপরীত হইয়া যায়। সিদ্ধেশ্বরের গৃহ এক্ষণে নির্জ্জন নীরব। সে সেই নীরবতার মধ্যে বসিয়া বসিয়া একটা অতৃপ্ত কামনার চিন্তা করে। সেই চিন্তাতেই হতভাগা একটু একটু সুখ পায়। ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া, তপজপ ছাড়িয়া, সেই অদম্য লালসার পূজা করিতেই সে এখন ভালবাসে এবং সেই পূজাই তাহার অভীষ্ট বরদাত্রী ভাবিয়া দিন কাটায়। কিন্তু এ ভাবে অধিক দিন কাটিল না। রুদ্ধ প্রাণের নীরব হাহাকার ক্রমেই তাহার অসহ্য হইল; কামনার করাল ছায়া সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। অতৃপ্ত জীবনে একটা সুখের আশা জাগিল। নির্ব্বোধ সিদ্ধেশ্বর সেই পাপ আশার অনুসরণ করিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় আকাশে বড় মেঘ উঠিয়াছিল। প্রবল বাতাসও বহিতেছিল। শীঘ্রই বৃষ্টি আসিবে বলিয়া সকলে অনুমান করিতেছিল। এমন সময়ে এই ভীষণ দুর্য্যোগে এক সন্ন্যাসী গোপালনগরে ভোলানাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে আশ্রয় লইল। একে অতিথি তাহাতে সন্ন্যাসী,— চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরম সমাদরে অতিথিকে গৃহে স্থান দিলেন,

এবং যথোচিত অতিথিসংকার করিয়া বৈঠকখানায় তাঁহার শয়নের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এ অতিথি আর কেহ নহে, সিদ্ধেশ্বর।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বর যাহাকে দেখিবার জন্য আসিল, হৃদয়ের উদ্দাম কামনা-প্রবাহ একবার—কেবল একবার মাত্র যাহার চরণে ঢালিয়া দিয়া আপনাকে চিরতৃপ্ত করিবার আশায় এখানে আসিল, তাহাকে তো দেখিতে পাইল না? মহামায়া তো দেখা দিল না। সিদ্ধেশ্বর সমস্ত রাত্রি এক প্রকার জাগিয়া কাটাইল। প্রভাত না হইতেই শয্যাত্যাগ করিয়া পাশের পুষ্করিণীতে হাত মুখ ধুইতে গেল। মুখ প্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ হইলে ঘাটের উপরে উঠিয়া দেখিল, উচ্ছিষ্ট পাত্র-হস্তে দাঁড়াইয়া শুভ্র-বসনাবৃতা এক রমণীমূর্ত্তি। তখনও কৃষ্ণাষ্টমীর শ্বেতকান্তি ক্ষীণ চন্দ্র মধ্যাকাশে জাগিয়া বসিয়াছিল। পুষ্করিণীর জলে তাহার নিষ্প্রভ প্রতিবিম্ব হিল্লোলে নাচিতেছিল। পূর্ব্বাকাশে একটা লাল আভা উঠিয়াছিল। সেই ক্ষীণালোকে সিদ্ধেশ্বর চমকিয়া দেখিল, সেই মূর্ত্তি—যে মূর্ত্তি কয়দিন হইতে তাহার হৃদয়ে অহরহঃ জাগিতেছে, এ সেই মূর্ত্তি। যে রূপের তীব্রজ্বালায় নিরন্তর তাহার অন্তস্তল পুড়িতেছে, ঐ সম্মুখে সেই প্রদীপ্ত পাবকশিখা। যে ধ্যানের ছবি খানিকে আর একবার দেখিবার জন্য হৃদয়

অস্থির হইয়াছিল, ছল করিয়া অতিথি সাজিয়াছিল, ঐ সেই মোহিনী প্রতিমা। দেখিয়া লও সিদ্ধেশ্বর, চক্ষু ভরিয়া ; প্রাণ পূরিয়া ঐ রূপ-গরল পান কর। মরিবার ভয় করিও না। তুমি তো একদিন মরিয়াছ। মানুষ কয়বার মরে ?

কিন্তু আশ মিটাইয়া সিদ্ধেশ্বরের দেখা হইল না। সেই সতীত্ব-তেজঃ-প্রদীপ্ত রূপবহ্নিজ্বালায় তাহার নয়ন ঝলসিয়া গেল ; সেই ধর্ম্মভাবপূর্ণ মুখজ্যোতিতে তাহার কলুষিত হৃদয় ভীত হইয়া পড়িল ; কিন্তু কামনার ছায়া আরও ঘনীভূত হইল। এদিক ওদিক চাহিয়া, দুই একবার ঢোক গিলিয়া কম্পিত কণ্ঠে সিদ্ধেশ্বর ডাকিল, "মহামায়া !"

সে স্বরে মহামায়া চমকিয়া উঠিল। সিদ্ধেশ্বর আবার ডাকিল, "মহামায়া !"

মহামায়া অকম্পিত স্বরে বলিল, "কেন ঠাকুর !"

সিদ্ধেশ্বর উন্মত্তের ন্যায় কহিল, "মহামায়া ! তুমি কে ? তোমার এত রূপ কেন ?"

শিহরিয়া মহামায়া কহিল, "আপনি সন্ন্যাসী, কি বলিতেছেন ?"

বিকৃতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বর কহিল, "না মহামায়া ! এখন আর আমি সন্ন্যাসী নই। আমি উন্মাদ—তোমার রূপে উন্মাদ ! প্রাণ যায় মহামায়া, আমাকে রক্ষা কর।"

ধীর গম্ভীর স্বরে মহামায়া কহিল, "ঠাকুর! আপনি সন্ন্যাসী। নতুবা ইহার উত্তরে—যাক্ আপনি সরিয়া যান।"

সেই কুলিশ-কঠোর স্বরে সিদ্ধেশ্বরের চমক হইল। চাহিয়া দেখিল, মহামায়ার মুখে কি অদ্ভুত বিক্রমচিহ্ন! কি অপূর্ব্ব জ্যোতি! নয়নে কি করাল অগ্নিশিখা! ভয়ে তাহার হৃদয় জড়ীভূত হইল। মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে দ্রুতগতিতে তথা হইতে পলায়ন করিল।

(৮)

সিদ্ধেশ্বর মহামায়ার নিকট হইতে পলাইল বটে, কিন্তু মহামায়ার সঙ্গ ছাড়িতে পারিল না। মহামায়ার মোহিনী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়পটে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে, পট না ভাঙ্গিলে সে চিত্র বুঝি মুছিবে না। মহামায়ার নিকট হইতে পলাইয়া সিদ্ধেশ্বর আর গৃহে গেল না, বরাবর কাশী অভিমুখে চলিল। সেখানে পৌছিয়া লোকারণ্য মধ্যে আপনাকে লুকাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। গুরুকে খুঁজিল, পাইল না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া, ভাগীরথীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সব শেষ করিতে ইচ্ছা করিল, সাহসে কুলাইল না। কাশী ত্যাগ করিয়া মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি কত তীর্থে ভ্রমণ করিল,

কিন্তু মহামায়া সঙ্গে। হিমালয়ের নির্জ্জন ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল, মহামায়ার স্মৃতি তাহাকে সেখান হইতেও টানিয়া আনিল। এইরূপে সে নানাস্থানে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে, প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য্য-সাগরের অভ্যন্তরে হৃদয়কে ডুবাইয়া রাঁখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই উষার অস্ফুটালোকে শুভ্রবসনা কোপস্ফুরিতাধরার ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ-শোভিত মুখখানি মনে পড়ে, আর সব গোলমাল হইয়া যায়। অবশেষে সিদ্ধেশ্বর প্রবৃত্তির তাড়না—স্মৃতির দারুণ কষাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া আবার দেশে ফিরিল।

নীরব মধ্যাহ্নে নদীঘাটে মহামায়া একাকিনী স্নান সমাপ্ত করিয়া উঠিতেছিল, সহসা দেখিল, সম্মুখে সিদ্ধেশ্বর। মহামায়া একটু ভীতা, একটু চমকিতা হইল ; পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিল। সিদ্ধেশ্বর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধিমতী মহামায়া মনে মনে ভীতা হইলেও বাহিরে সাহস দেখাইবার জন্য স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সিদ্ধেশ্বর চাহিয়া দেখিল, কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ! বর্ষণ বিধৌত চম্পকগুচ্ছবৎ বারি-সম্মার্জ্জিত রূপরাশি আর্দ্রবস্ত্র ফুটিয়া বাহির হইতেছে ; আলুলায়িত ঘন সুচিক্কণ কেশভার পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া পড়িয়াছে, কতক বা বিক্ষিপ্ত ভাবে অংসে

বাহুমূলে লুটাইতেছে। তাহাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লাবণ্য-জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। ললাটপতিত কুঞ্চিতালক-নিঃসৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু গণ্ড বহিয়া মুক্তাফলের সৌভাগ্য লাভ করিতেছে। কে যেন সিদ্ধেশ্বরের সম্মুখে সৌন্দর্য্যের রুদ্ধ শতদ্বার এককালে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে! দেখিতে দেখিতে সিদ্ধেশ্বর আত্মহারা হইয়া পড়িল, তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না।

মহামায়া সাহসে ভর করিয়া বলিল, "ঠাকুর! পথ ছাড়িয়া দিন।"

সিদ্ধেশ্বরের কথা ফুটিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মহা-মায়া! ভাল আছ?"

মহামায়া বলিল, "হাঁ, আপনি সরিয়া দাঁড়ান।"

সিদ্ধেশ্বর রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সরিব, কিন্তু—কিন্তু একটা কথা শুনিবে কি?"

মহামায়া। কি?

সিদ্ধেশ্বর মহামায়ার পদতলে আছড়াইয়া পড়িল। মহামায়া পশ্চাতে সরিয়া গেল। সেইখানে বসিয়া বসিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে সিদ্ধেশ্বর বলিল,—"প্রাণ যায় মহামায়া! আমাকে বাঁচাও। অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারিলাম না। কেন মহামায়া! এত রূপ লইয়া

আমার সম্মুখে দাঁড়াইলে? দাঁড়াইলে তো এখন বাঁচাইবে না কেন?"

মহামায়া সভয় দৃষ্টিতে একবার চারি দিকে চাহিল। দেখিল নির্জ্জন নদীতীর, কেহ কোথাও নাই। বুঝিল যে, এক্ষণে সাহস ভিন্ন তাহার আর উপায় নাই। সে স্থিরকণ্ঠে বলিল,—"ঠাকুর! এখনো পথ ছাড়, নতুবা চীৎকার করিয়া লোক ডাকিব।"

সিদ্ধেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্থির কণ্ঠে বলিল,—"ডাক, কিন্তু মহামায়া! আর না, জীবনের আশা, লজ্জা, ভয় সব ত্যাগ করিয়াছি। বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এখন কেবল এক বিন্দু—একবিন্দু মাত্র জল। আজ আর ছাড়িব না মহামায়া—"

উন্মত্তবৎ অস্থিরপদে সিদ্ধেশ্বর মহামায়ার দিকে অগ্রসর হইল। মহামায়া মনে মনে ডাকিল,—"কোথায় হে অনাথ-নাথ! অসহায়ের সহায়! আমার যে সর্ব্বস্ব যায় প্রভু!"

সহসা সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি নদীর পরপারে পড়িল। কে ও নদীতীরে অশ্বত্থমূলে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী? গুরুদেব না? সিদ্ধেশ্বর ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সেই দিন রজনীতে সিদ্ধেশ্বর গুরুদেবের দর্শন পাইল। গম্ভীর স্বরে গুরুদেব ডাকিলেন,—"সিদ্ধেশ্বর!"

সিদ্ধেশ্বর উত্তর করিল,—"প্রভু !"

গুরু। প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছ ?

নতমুখে সিদ্ধেশ্বর বলিল,—"না।"

গুরুদেব বলিলেন,—"প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কি প্রায়শ্চিত্ত জান ?"

উদ্বেগ বিকম্পিত হৃদয়ে গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল,—"কি প্রায়শ্চিত্ত প্রভু !"

রুদ্রকণ্ঠে গুরুদেব বলিলেন,—"এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিস্মৃতি। পারিবে ?"

সিদ্ধেশ্বর বলিল,—"না।"

গুরুদেব বলিলেন,—"তবে তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু !"

সিদ্ধেশ্বরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই ?"

সিদ্ধেশ্বর চাহিয়া দেখিল, গুরুদেব অন্তর্হিত। কেবল দিগন্ত তাহার প্রশ্নের প্রতিধ্বনি তুলিয়া উত্তর করিতেছে, 'নাই'; গর্জ্জন করিয়া দারকেশ্বর বলিতেছে,—'নাই, নাই'; সেই সমবেত প্রতিধ্বনি ব্যোমপ্রান্তে প্রহত হইয়া যেন অনন্তকণ্ঠে ভৈরবনিনাদে বলিয়া দিতেছে,—'নাই, নাই, নাই !'

সিদ্ধেশ্বর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এখনও যেন তাহার কর্ণে গুরুদেবের শেষ বাক্য ধ্বনিত হইতেছিল, 'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু'। তাহার চারিদিকে নিরন্তর মেঘমন্দ্রে শব্দিত হইতেছে—মৃত্যু! মৃত্যু!! যে দিকে যায়, সেই দিক হইতেই যেন শুনিতে পায়, কে বিকট স্বরে ডাকিয়া বলিতেছে, মৃত্যু! মৃত্যু!! মৃত্যু!!! সে ধ্বনিতে সিদ্ধেশ্বর অস্থির হইয়া উঠিল।

ক্রমে সিদ্ধেশ্বর উন্মাদপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত জীবনব্যাপী বৈফল্য, উৎসাহে অবসাদ, আশায় নিরাশা, কার্য্যে অসিদ্ধি, তাহার উপর গুরুদেবের সেই মহা প্রায়শ্চিত্তের অনুজ্ঞা, হৃদয়ে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত করিল। সে আলোড়নের পরিণাম যাহা হইল, তাহা অতি শোচনীয়—বিষাদময়। সিদ্ধেশ্বর এখন আর গৃহে থাকে না। কখনও বৃক্ষতলে, কখনও নদীতীরে, কখনও শ্মশানেশ্বরের মন্দিরবাহিরে পড়িয়া দিন কাটায়। সময়ে সময়ে গোপালনগরে দারকেশ্বরের ঘাটেও দুই একদিন পড়িয়া থাকে। আহারের চেষ্টা নাই। দয়া করিয়া কেহ কিছু খাইতে দিলে কখন খায়, কখন বা সম্মুখস্থ কুকুরদলকে বিতরণ করিয়া চলিয়া যায়। তাহার আর সে কান্তিপূর্ণ দেহ নাই, তাহা এক্ষণে শীর্ণ; মলিন কেশজাল ধূলি-ধূসরিত;

চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট; দৃষ্টি নিরাশাপূর্ণ, কঠোর, শূন্যে নিবদ্ধ। সে এখন সর্ব্বদা একা বসিয়া কি ভাবে; ভাবিতে ভাবিতে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে; ডাকিলে উত্তর দেয় না। অনেক চেষ্টা করিলেও একটীও কথা কহে না। কেবল গভীর নিশীথে—যখন জগৎ নীরব সুষুপ্ত, তখন কেহ কদাচিৎ শুনিত, নির্জ্জন নদীতীর, নীরব শ্মশান প্রতিধ্বনিত করিয়া কে বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, 'মহামায়া! মহামায়া!' সেই হৃদয়ভেদী করুণ চীৎকার নৈশ বায়ুতরঙ্গে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।

এই ভাবে কিছুদিন কাটিল।

(৯)

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। নির্ম্মেঘ আকাশে চাঁদ বড়ই হাসিতেছিল। সুপ্তা প্রকৃতির গাত্রে শুভ্র জ্যোৎস্নার আবরণ-খানি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দারকেশ্বর ছোট ছোট তরঙ্গ-গুলিকে ঘুম পাড়াইয়া, একটা অস্ফুট মধুর ভাষায় গাহিয়া গাহিয়া কোথায় কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিতেছিল। তীরের গাছগুলা অনেকক্ষণ হইতে প্রকৃতি মাতার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছেলের মত এক একবার জাগিয়া, মাথা নাড়া দিয়া আবার চুপ করিতেছিল। শব্দহীন সুষুপ্ত পৃথিবী, প্রান্তর, নদী, আকাশ সমস্তই কৌমুদী-

সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। সেই শুভ্র কৌমুদীস্নাত নদী-প্রবাহ-চুম্বিত সোপানের উপর বসিয়া একা সিদ্ধেশ্বর।

দণ্ডের পর দণ্ড অতীত হইতে লাগিল। সেই নীরব রাজ্যে—সেই ভীষণ শ্মশানে ক্ষণে ক্ষণে কত বিভীষিকার চিত্র জাগিয়া উঠিতেছিল। নৈশ বায়ুপ্রবাহে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পলাশ গাছগুলা বিকটাকার প্রেতমূর্ত্তির অনুকরণ করিতেছিল। সেই সময়ে সেই স্থানে আসিলে অতি সাহসিকের হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর স্থির ধীর নীরব। ঘাটের উপর বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ হইতে একটা পেচক বিকট স্বরে রাত্রির পরিমাণ ঘোষণা করিল। সিদ্ধেশ্বর একটা বুকভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার শ্মশানেশ্বরের মন্দিরের দিকে চাহিল, একবার জ্যোৎস্নাপরিপ্লাবিত নক্ষত্রখচিত উদার অনন্ত আকাশের দিকে চাহিল, একবার অনন্তপথযাত্রী দারকেশ্বরের দিকে চাহিল। তারপর বিকৃত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—"মহামায়া! মহামায়া!" উন্মাদ কণ্ঠের উচ্চ হাহাকার জ্যোৎস্নাতরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া দারকেশ্বরের খর প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের জন্য নদীবক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল; কয়েকটা তরঙ্গ আসিয়া সোপানপ্রান্তে আছাড়িয়া

পড়িল। মুহূর্ত্ত পরেই সব স্থির। সংসারপথের পথভ্রান্ত পথিক সিদ্ধেশ্বরকে বক্ষে লইয়া দারকেশ্বর অনন্তের পথে ছুটিল।

যাও সিদ্ধেশ্বর! পার যদি, পরজন্মে মহামায়াকে দূরে রাখিও।

দুই ভাই।

(১)

ছোট ভাই হরিশ যখন সীতানাথ বাবুর জমিদারী সোণাগঞ্জে সাত টাকা বেতনে তহশীলদার পদে নিযুক্ত হইল, তখন বড় ভাই কেনারামের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আশার সাফল্যজনিত গর্ব্বে তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যৌবনারম্ভেই কেনারাম মাতৃপিতৃহীন হইয়া সংসারের বহু কষ্ট—অশেষ তাড়নার মধ্যেও ভাইটীকে মানুষ করিয়াছে, লেখা পড়াও কিছু শিখাইয়াছে। আজি সেই ভাই—সেই দাদাগতপ্রাণ হরিশের উন্নতিতে তাহার গর্ব্ব না হইবে কেন? যে একটী ক্ষুদ্র অঙ্কুরের মূলে সে এতদিন প্রাণপণে জলসেচন করিতে করিতে আপনার বুক দিয়া তাহাকে সংসারের খরতাপ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, আজি সেই সযত্নপালিত ক্ষুদ্র তরুটীর নবপল্লবিত শাখায় একটী প্রথমোদ্গত মুকুল দেখিয়া তাহার আনন্দ

না হইবে কেন? সম্মুখে আশার মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া কেনারামের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি নাচিয়া উঠিল।

কেনারাম লোকটী ভাল; তাহার প্রাণটা বড় সাদা। মাতা পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই। এই জন্যই বোধ হয় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসাটা হরিশের উপরই পড়িয়াছিল। কিন্তু এজন্য শেষে লোকে তাহাকে নির্ব্বোধ, গোবেচারা প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিলেও কেনারামের তাহাতে এতটুকুও দুঃখ বা অনুতাপ হয় নাই। সে যেমন হৃদয়খানি লইয়া সংসারে আসিয়াছিল, তেমনই কাজ করিয়া যাইতেছিল; সংসারের কুটিল সমালোচনার দিকে একটুও লক্ষ্য করিবার অবসর বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না।

কেনারাম জাতিতে কৈবর্ত্ত; চাষই জীবিকা। তাহার ষোলবিঘা সাড়ে তের কাঠা জমি চাষ, দুইটী বলদ, একখানি হাল। নিজের হাতেই চাষ করিত, এজন্য কখনও সে হরিশের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করিত না। তাহার সেই অশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে জমিতে সোণা ফলিত, লোকে বলিত, কেনারাম কি জানে। সংসারে বড় বৌ-ই একা কর্ত্রী, গৃহিণী, দাসী সকলই। তাহার ক্লান্তিহীন বিরাগহীন নীরব পরিশ্রমে কেনারামের ক্ষুদ্র

সংসারটী সুখের—শান্তির আশ্রয় হইয়াছিল। এই সুখের সংসারের মধ্যে সন্তানহীন দম্পতীর দুইটী হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত আশীর্ব্বাদ লইয়া শ্রীমান্ হরিশচন্দ্র মাইতি সোণাগঞ্জের গোমস্তা বা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিল।

বেতনের পরিমাণ সাত টাকা হইলেও বৎসরান্তে হরিশের আয়ের পরিমাণটা যখন তিন শত হইল, এবং সেই টাকাগুলা আনিয়া হরিশ যখন দাদার হাতে দিতে লাগিল, তখন কেনা-রাম ভগ্নপ্রায় পুরাতন ঘর দুই খানা ভাঙ্গিয়া দুই খানা নূতন মেটে ঘরের পত্তন করিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেরই ৺মহেশ বেরার কন্যার সহিত ভ্রাতার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিল। মেয়েটীর বিধবা মাতা ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। মেয়েটী বড়, দেখিতেও ভাল। সাড়ে পাঁচগণ্ডা টাকা কন্যাপণ দিয়া কেনারাম মাঘ মাসের মধ্যেই তাহাকে ভ্রাতৃ-বধূরূপে ঘরে আনিল। মেয়েটী আসিয়াই বড় বোয়ের হৃদয় হইতে হরিশের চিরপ্রাপ্য ভালবাসাটুকু কাড়িয়া লইল। এজন্য কখন কখনও হরিশ দাবী করিত বটে, কিন্তু তাহার সে দাবী টিকিত না। বড় বোয়ের মুখ-নিঃসৃত কতকগুলা শ্লেষপূর্ণ উপহাস শুনিয়াই তাহাকে ভয়ে ভয়ে দাবী উঠাইয়া লইতে হইত।

কন্যাকে শ্বশুর বাড়ীতে রাখিয়া ছোট বোয়ের মা একা

থাকিতে পারিতেন না। প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে আসিতেন, মধ্যে মধ্যে দুই একদিন থাকিয়াও যাইতেন। ইহাতে কেনারাম বা বড় বৌ অসন্তুষ্ট ছিল না, বরং আনন্দিত হইত। কিন্তু একদিন কেনারামের জ্ঞাতি বৃদ্ধ মাধব খুড়া, কেনারামকে বলিয়াছিল, "বাবাজি! বেয়ান মাগীর জামাই বাড়ীতে এত ঘন ঘন যাতায়াত কেন?"

কেনারাম বলিয়াছিল, "তা খুড়া, গ্রামে ঘরে দোষ কি। উনি মেয়েকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।"

বৃদ্ধ বলিয়াছিল, "কিন্তু কিনু! শেষে মাগী পাছে জামাই-কেও না ছাড়িতে পারে, তাই ভাবনা। মাগীরা জামাইয়ের জন্য চোকে লঙ্কা দিয়া যত কাঁদে, তোমার জন্যতো তত কাঁদিবে না। ঘর সামালো।"

কেনারাম বৃদ্ধের কথাটা বুঝিল, কিন্তু তাহা তাহার ভাল লাগিল না। হরিশ তাহাকে পর করিবে, একথাটা যে মনেও করে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই।

বড়ই সুখে—বড়ই শান্তিতে কেনারামের ক্ষুদ্র সংসারটী চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনটী বৎসর জলের মত চলিয়া গেল।

(২)

তিন বৎসর পরে হরিশের একটী পুত্র হইল। বড় বৌ

সগর্ব্বে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। অল্প দিনের মধ্যেই সেই ক্ষুদ্র শিশুটী হরিশ, ছোট বৌ উভয়কেই নির্ব্বাসিত করিয়া বড় বোয়ের হৃদয়রাজ্যে আপনার ভালবাসার সুদৃঢ় সিংহাসন স্থাপিত করিল। বড়বৌ আদর করিয়া তাহার নাম রাখিল গোপাল।

ইহার পর হইতে হরিশের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আগমনের এবং অবস্থিতির মাত্রাটা কিছু বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের দুই একটা কাজে কর্ত্রীপদ গ্রহণ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। কেনারাম বা বড়বৌ ইহাতে কোন আপত্তি করিল না, আপত্তির কোন কারণও দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহারা না দেখিলেও তাহাদের অগোচরে এই সময় হইতেই সেই সুখের সংসারটীর উপর দিয়া কোন চিরনির্ব্বাসিত হতভাগ্যের দগ্ধ নিশ্বাসের মত যেন একটু একটু অশান্তির বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। মা ও মেয়ের সতর্ক দৃষ্টির সহিত গুপ্ত পরামর্শটাও চলিতে লাগিল; সংসারের অনেক কাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিল; কেনারামও আর পূর্ব্বের মত হরিশের নিকট হইতে যথা সময়ে টাকা পাইল না। হঠাৎ যেন কোন্ অজ্ঞাত প্রেতরাজ্য হইতে উদাসীনতার—অশান্তির একটা কাল ছায়া আসিয়া সকলেরই হৃদয়ে চাপিয়া বসিল; কেনারামের সুখময়

শান্তিময় আশাপূর্ণ সংসার-স্রোতটী নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে কোন্ নিষ্ঠুর দেবতার জলন্ত অভিশাপে সহসা বিপথগামী হইল।

এই ঘোর বিপ্লবের উদ্যোগ পর্ব্বের সময় ধূর্ত্ত স্বর্ণকার এক জোড়া পুরাতন তাবিজ বিক্রয়ের জন্য আনিল; ছোট বৌ এবং তাহার মাতা তাহা লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। এমন কি মাতা কন্যার হস্তে তাবিজ জোড়াটা পরাইয়া দিলেন। বড়বৌও আসিয়া কেনারামকে ধরিল। কিন্তু কেনারাম বলিল, "এখন চাষের সময় একশত টাকা দিয়া গহনা কেনা হইবে না। চাষ ফুরাইলে নিশ্চয়ই কিনিয়া দিব।"

বড় বোয়ের মুখে সে কথা শুনিয়া ছোট বোয়ের মাতা বলিলেন, "তা' হোক্ না মা, রাণীতো তোমার ছোট বোন। তা' তোমার না হয় দুদিন পরেই হ'তো। এ জিনিষটা ভাল ছিল, তুমিই বা না নিলে কেন?"

সহসা কে যেন বড় বোয়ের বুকে একটা নিষ্ঠুর কষাঘাত করিল; সে আঘাতে তাহার পাঁজরের এক খানা হাড় বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ইহার একমাস পরে হরিশ যখন দেড়শত টাকা দিয়া ছোট বোয়ের জন্য এক জোড়া নূতন তাবিজ আনিল, তখন

কেনারাম বড়বৌকে বলিল, "কেন বড়বৌ! আমি কি ছোটবৌমাকে তাবিজ কিনিয়া দিতাম না?"

কেনারামের স্বর অভিমানে ভগ্ন। বড়বৌ বলিল, "তা' হোক, তুমি ঠাকুরপোর উপর রাগ করিও না। ও ছেলে মানুষ, কি জানে?"

কেনারাম বলিল, "সত্যি বড়বৌ! হরিশ কি জানে, ও এখনও ছেলে মানুষ।"

উভয়েই আপনাদের চিরপরিচিত স্নেহের আবরণ দিয়া বুকের ব্যথাটাকে চাপিতে চেষ্টা করিল।

কিন্তু এরূপ চাপিয়া আর কতদিন চলে। ক্রমেই অশান্তি বাড়িতে লাগিল। এখন কারণে অকারণে কলহ ভিন্ন দিন যায় না। সে কলহ ক্রমে হরিশের বা ছোট বোয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। ছোট বোয়ের মাতাতো কুটুম্বের মেয়ে, তিনি এত সহিবেন কেন। অগত্যা প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নেই তাঁহাকে কাপড় বগলে করিয়া আপনার ভগ্ন কুটীরে পলায়ন করিতে হইত; আবার পোড়া মায়ের মন বুঝিত না বলিয়াই প্রাতঃকালেই দর্শন দিতেন। যখন বেশী অসহ্য হইত, তখন অসাবধানে বলিয়া ফেলিতেন, "যে ভায়ের রোজগারের মুঠো মুঠো টাকা খায়, সে চাষার মাগের এত তেজ কেন?"

কথাটা শুনিয়া বড়বৌ সবলে গোপালকে বুকে চাপিয়া ধরিত।

শেষে একদিন সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া বৃদ্ধ মাধব খুড়া বলিল, "কিনু! জামাই-ই বেয়ানের আপনার; তাই বলিয়া তুমিও মাগীকে আপনার করিতে গেলে চলিবে কেন বল?"

কেনারাম কিছু বলিতে পারিল না, কেবল দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু [illegible] উপর পড়িল

(৩)

কয়েকদিনের মধ্যেই কেনারামের চিরপ্রবাহিত স্নেহ-স্রোতটাকে রুদ্ধ করিবার জন্যই যেন তাহার বুকটাকে চাপিয়া উঠানের মাঝখানে একটা প্রাচীর উঠিল। তবে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অনুরোধেই মধ্যে একটা দ্বার রহিল। সেটা কেবল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া জ্ঞাতির হিংসাপূর্ণ হৃদয়ে বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইবার জন্য। কিন্তু এই প্রাচীরের ক্ষুদ্র ব্যবধানটা, বড়মার প্রবল স্নেহাকর্ষণে আকৃষ্ট গোপালের ক্ষুদ্র হৃদয় খানিকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বড়মা যে হিংসাস্বভাবা জ্ঞাতিরমণী ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহার নিকট জ্বলন্ত বিদ্বেষ ভিন্ন স্নেহশ্রদ্ধা আদর যত্ন পাওয়া যে অসম্ভব, এ কথাটুকু

সে নির্ব্বোধশিশু কিছুতেই বুঝিল না। বড়মার কাছে না থাকিলে তাহার স্বস্তি হয় না, বড়মার হাতে না হইলে খাইতে পারে না, বড়মার কোল না পাইলে ঘুমায় না। অনেক সান্ত্বনা, অনেক শাসন, অনেক তাড়নার পর সকলেই হাল ছাড়িয়া দিল। বুঝিল যে, মাগী ডান, ছেলেকে ওষুধ করিয়াছে।

এতদূর হইলেও হরিশ কিন্তু এখনও দাদার সহিত প্রত্যক্ষ বিবাদ করিতে সাহস করে নাই। অবশেষে তাহাও ঘটিল। বাড়ীর মধ্যে একটী প্রাচীন পেয়ারা গাছ ছিল। গাছটী কেনারামের উঠানে ছিল। সেটী কেনারামের পিতার স্বহস্ত-রোপিত এবং সযত্নবর্দ্ধিত। আগে সেটীতে ভাল পেয়ারা হইত, কিন্তু এখন আর তেমন ভাল ফল হয় না। তথাপি পিতার শেষ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে কেনারাম এতদিন তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। তাহার একটা ডাল বাড়িয়া হরিশের চালের উপর পড়িয়াছিল। একটু ঝড় হইলেই সেটা চালের উপর লুটোপুটি খাইত, তাহাতে চালের খড়গুলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইত।

ইহা দেখিয়া একদিন হরিশ, কেনারামকে বলিল, "পেয়ারা গাছটা কাটিতে হইবে।"

কেনারাম বলিল, "কেন?"

হরিশ। আমার চাল নষ্ট করিতেছে।

কেনা। ঐ ডালের খানিকটা কাটিলেই হইবে।

কথাটা ঠিক, কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণ বলিয়াছেন যে, ওর উঠানে গাছ, ও একাই ফলভোগ করিবে। ওটাকে না রাখাই উচিত। হরিশও কথাটা ঠিক বুঝিয়াছিল। তাই সে বলিল, "না, গাছটাই কাটিতে হইবে, ডাল আবার বাড়িতে পারে।"

কেনা। তাহা হইবে না।

হরিশ। হইতেই হইবে।

কেনা। না হরিশ! বাবার শেষ চিহ্নটুকু মুছিতে পারিব না। আমি থাকিতে গাছ কাটা হইবে না।

কি, সে থাকিতে গাছ কাটা হইবে না? হরিশ কি এতই দুর্ব্বল? সোণাগঞ্জের গোমস্তা বা সর্ব্বেসর্ব্বা হরিশ বাবু চাষা কেনারামের হুকুমে নিরস্ত হইবে? এতটা অপমান স্বীকার করিয়া স্ত্রী ও শাশুড়ীর নিকট আপনাকে দুর্ব্বল প্রতিপন্ন করিতে হরিশের গর্ব্বিত হৃদয় কিছুতেই সম্মত হইল না। সে ছুটিয়া বাটী হইতে কুঠার আনিল এবং আপনিই গাছ কাটিতে উদ্যত হইল। কেনারাম কিছু না বলিয়া তাহার হাত হইতে কুঠার কাড়িয়া লইল. এবং তাহার হাত ধরিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। হরিশের অপেক্ষা

কেনারামের শক্তি অধিক। অগত্যা সে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান করিল।

এই দিন হইতে হরিশ, দাদাকে আপনার প্রবল শত্রু জ্ঞান করিল, এবং প্রকাশ্যে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

(৪)

ইহার পর একদিন গোপাল তাহার বড় মার বাটীতে কি খাইয়া আসিয়া কেবল বমন করিতে লাগিল। সে দিন হরিশ বাটীতে ছিল না। ছোট বৌ অস্থির হইয়া উঠিল, তাহার মাতা চীৎকার করিয়া পাড়ার লোক জড় করিলেন। ডাক্তার আসিল। ঔষধের দ্বারা বমন বন্ধ হইল। ডাক্তার বলিলেন, কোন বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণেই এরূপ হইয়াছিল, তবে বমন হইয়াছে এই রক্ষা, নতুবা প্রাণরক্ষা কঠিন হইত। প্রবাদ, ডাক্তার বাবু প্রাইমারী পরীক্ষার শেষদিনে পাঠ্য পুস্তকের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া পৈতৃক থার্ম্মোমিটার ও ষ্টেথিস্কোপ পকেটে গুঁজিয়াছেন। যাহা হউক, ডাক্তারের কথা শুনিয়া সকলেই বলিল, হায় হায়, এমন শত্রুতাও করে! থানায় খবর দিয়া মাগীর হাতে দড়ি দেওয়া উচিত।

আসল কথাটা,—গোপাল বড়মার ঘরে গিয়া তাহার

অগোচরে মিছরি বোধে এক টুক্রা ফট্‌কিরি খাইয়া আসিয়াছিল।

ক্রমে গোপালের অসুখের কথাটা বড় বোয়ের কাণে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া সেখানে আসিল। গোপাল তখন ক্লান্ত হইয়া শুইয়াছিল। বড়বৌ আসিয়াই তাহাকে কোলে টানিয়া তুলিল। অমনই ছোটবোয়ের মাতা "রাক্ষসী" বলিয়া তাহার কোল হইতে গোপালকে কাড়িয়া লইলেন। বড়বোয়ের হৃৎপিণ্ডটা যেন কে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইল। সকলেই তাহার দিকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। বড়বৌ ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার সন্তানহীন শূন্য হৃদয়টা 'হায় হায়' করিয়া উঠিল।

পরদিন হরিশ বাটী আসিয়া সমস্ত শুনিল। শুনিয়াই প্রাচীরের নিকট দাঁড়াইয়া বড়দাদা ও বড়বৌকে শুনাইয়া অনেক গালাগালি করিল। অসহ্য হইলে কেনারামও তাহার দুই একটা কড়া উত্তর দিল। রাগে হরিশ সন্ধ্যার পর কেনারামের তিনবিঘা জমির মেঘের মত শ্যামল, জমিভরা ধান্যগুলাকে একবারে কাটিয়া দিয়া আসিল। পরদিন জমি দেখিয়া কেনারামের বুক ফাটিয়া গেল। কে যেন তাহার বুকের হাড়গুলাকে কঠোর পদাঘাতে চূ

করিয়া দিয়াছে। সে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল, নিশ্বাস রোধ করিয়া জমির দিকে চাহিয়া রহিল। পাছে হরিশের উদ্দেশে তাহার একটা বুকভাঙ্গা তপ্ত নিশ্বাস পড়ে। জমির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আসিল। সযত্নে তাহা রোধ করিয়া কেনারাম দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। ভয়, পাছে তাহার সেই একবিন্দু অশ্রুতে হরিশের কোন অমঙ্গল হয়।

অনেকে কেনারামকে হরিশের নামে নালিস করিতে পরামর্শ দিল, কিন্তু কেনারাম তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। মনে মনে বলিল, 'সকলে পাগল নাকি! ভাইয়ের নামে আবার নালিস!' এমনই ভ্রাতৃস্নেহ!

কিন্তু কেনারাম কিছু না বলিলেও অনেকেই হরিশকে ছি্ছি করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কেনারামেরও প্রশংসা করিল। তাহা শুনিয়া হরিশ আরও জ্বলিয়া উঠিল।

ইহার কয়েক দিন পরে একদিন কেনারাম তাহার জমিতে কাজ করিতেছিল। পাশেই হরিশের জমি। সেই জমি হইতে অন্য এক ব্যক্তি খানিকটা জল কাটাইয়া লইয়াছিল। হরিশ জমির নিকট দাঁড়াইয়া তাহাকে গালাগালি করিতেছিল। সে ব্যক্তিও তখন তথায় উপস্থিত। সেও প্রত্যুত্তর স্বরূপে হরিশকে গালাগালি করিল। ক্রমে

গালাগালি মারামারিতে পরিণত হইল। দূর হইতে দেখিয়া কেনারাম ছুটিয়া আসিল। কিন্তু তাহার আসিবার পূর্ব্বেই হরিশ সে ব্যক্তিকে রীতিমত প্রহার করিয়া এক তাহার জমির খানিকটা ধান ঘাঁটিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে সে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল কেনারাম সেই প্রহৃত ব্যক্তির নিকট বসিয়া তাহাকে কি বলিতেছে।

প্রহৃত ব্যক্তি এ অপমান সহ্য করিল না, সে আদালতে হরিশের নামে নালিস করিল। কেনারামের নামে সাক্ষীর শমন আসিল। কিন্তু প্রথমে সে ভ্রাতার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে কিছুতেই স্বীকার করিল না। শেষে সকলেই যখন বলিল, সাক্ষী না দিলে আদালতের অবমাননা করা হইবে এবং তাহাতে তাহার জেল পর্য্যন্ত হইতে পারে, তখন অগত্যা তাহাকে সাক্ষ্য দিতে হইল। হরিশের বিপক্ষে কিছু বলিতে ইচ্ছা না করিলেও উকীলের জেরায় তাহার মুখ দিয়া সমস্ত কথাই বাহির হইয়া পড়িল। বিচারে হরিশের পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইল। কেনারাম মনে মনে বলিল, হায়, আমিই জেলে গেলাম না কেন? কিন্তু হরিশ ভাবিল, এ সকলই কেনারামের চক্রান্ত। তাহারই মন্ত্রণায় এবং তাহারই সাক্ষ্যে এই দণ্ড হইল। ক্রুদ্ধ হরিশ

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, ইহার শোধ যদি না লইতে পারি, তবে আমার পাটোয়ারি বুদ্ধিতেই ধিক্!

(৫)

একদিন রাত্রিতে হরিশের গৃহে চোর চোর শব্দ শুনিয়া পাড়ার অনেক লোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আসিয়া দেখিল, চোর তখন পলায়ন করিয়াছে, উঠানের একপাশে একটা ভাঙ্গা বাক্স পড়িয়া রহিয়াছে। হরিশ আলোক লইয়া কয়েকজন লোকের সহিত বাটীর চারিদিক অন্বেষণ করিল, কিন্তু চোর তখন সেখানে ধরা দিবার জন্য বসিয়া ছিল না, কেবল উঠানের প্রাচীরের মধ্যে যে দ্বার দিয়া কেনারামের বাটীতে যাওয়া যায়, সেই দ্বারটা খোলা ছিল।

সকালে থানায় খবর গেল। মধ্যাহ্নকালে দারোগা বাবু ঘোড়ায় চড়িয়া দলবলসহ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে মহেশপুর গ্রামখানা তোলপাড় হইয়া উঠিল। গয়লা বৌ দুধের কেঁড়ে লুকাইল, মুদী দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিল, মাছগুলা পুষ্করিণীর গভীর জলে আশ্রয় লইল। দারোগা বাবু সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হরিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার উপর তাহার সন্দেহ হয়।

হরিশ বলিল, চোরকে সে এক প্রকার চিনিয়াছিল, কিন্তু

তাহার নাম করিতে সে এখন রাজি নহে। যাহা হইবার হইয়াছে, আর কেলেঙ্কারীতে কাজ নাই। তবে কেবল আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কর্ত্তব্য বোধে সে থানায় খবর দিয়াছিল।

কিন্তু হরিশ রাজি না হইলেও দারোগা বাবু ছাড়িবেন কেন? অনেক জেদাজেদির পর ভয়ে হরিশকে চোরের নাম করিতে হইল। চোর আর কেহ নহে, তাহারই দাদা কেনারাম। হরিশের কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই শিহরিয়া উঠিল। সকলে মনে করিল, এ সন্দেহটা কেবল কেনারামকে অপমানিত করিয়া প্রতিশোধ লওয়া। কিন্তু খানাতল্লাসীর সময় যখন কেনারামের উঠানে পেয়ারা তলায় খানিকটা সদ্য-উত্তোলিত মৃত্তিকা প্রথমেই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং যখন তাহার ভিতর হইতে এক ছড়া তাবিজ বাহির হইল, তখন সকলেই অবাক্ হইয়া পরস্পর বলাবলি করিল, লোককে চেনা দায়। কেনারামের হাতে হাতকড়ি পড়িল। যথোচিত নিগ্রহের পর দারোগা বাবু তাহাকে চালান দিলেন। চৌকিদার কনেষ্টবল বেষ্টিত হইয়া কেনারাম হাজতে ঢুকিল। বড়বৌকে শুনাইয়া শুনাইয়া হরিশের শাশুড়ী ঠাকরুণ বলিতে লাগিলেন, "এখনও ধর্ম্ম আছে, রাতদিন হচ্ছে, যিনি আমাদের হিংসা করবেন,

আমাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করবেন, হে বাবা হরি! তার বিচার তুমি কোরো।"

হরি তাঁহার এই অভিযোগ শুনিয়াছিলেন কি না, এবং শুনিয়া তাহার কোন বিচার করিয়াছিলেন কি না, তাহা হরিই জানেন, কিন্তু ইহা শুনিয়া বড়বৌ তুলসীতলায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, "হে ঠাকুর! কোন্ পাপে আমার সদাশিব স্বামীর এই শাস্তি?"

যথাসময়ে আদালতে মোকদ্দমা উঠিল। হরিশের পক্ষে দুইজন বড় বড় উকীল নিযুক্ত হইল, কেনারামও একজন উকীল নিযুক্ত করিল। হরিশের পক্ষ হইয়া অনেক সাক্ষী উপস্থিত হইল। দুই একজন ভদ্রলোক বড়বোয়ের কাঁদা-কাটায় দয়াপরবশ হইয়া আসামীর চরিত্র বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। সকলের সাক্ষ্যেই ভ্রাতৃদ্বয়ের সাংসারিক বিরোধের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। আসামীকে দেখিয়া অবধি হাকিমের মনে মোকদ্দমা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে হরিশের পক্ষীয় সাক্ষিগণের কথার অনৈক্য এবং কেনারামের প্রতি হরিশের ঘোর বিদ্বেষের কথা শুনিয়া তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। আরও বুঝিলেন যে, যে চোর, সে যে অপহৃত জিনিষ উঠানের মাঝখানে— যেখানে প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এমন

জায়গায় পুঁতিয়া রাখিয়া আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক ধরা দিবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব। হাকিম মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন, এবং মিথ্যা অভিযোগের জন্য হরিশকে ২১১ ধারায় অভিযুক্ত না হইবার কারণ প্রদর্শন করিতে বলিলেন। ক্রোধে ক্ষোভে হরিশ উন্মাদ হইয়া উঠিল। তাহার হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

(৬)

এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু গোপালকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। সে সমভাবে বড়মার স্নেহধারা টুকু পাইবার জন্য নিয়ত ছুটিয়া আসিত। বড়মাও এই ক্ষুদ্র ভিখারিটীকে কোন দিনই তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেন না। যে দিন কেনারাম পুলিসে চালান গেল, সে দিন গোপাল বড়-মার চক্ষুজলের সহিত আপনার ক্ষুদ্র ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটীর জল মিশাইয়া বড় কান্নাই কাঁদিল। তাহার কান্না দেখিয়া বড়বৌ আপনার চক্ষুজল মুছিল, শেষে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার অশ্রুসিক্ত কপোলে শত চুম্বন করিল। সে স্নেহচুম্বনে গোপাল হাসিল, বড়বৌ মুহূর্ত্তে ঠাকুরপোর উপর, ছোট যায়ের উপর সমস্ত রাগ ভুলিয়া গেল।

তারপর মোকদ্দমায় অব্যাহতি পাইয়া কেনারাম যখন বাড়ী আসিল, তখন গোপাল ছুটিয়া আসিয়া দুইটী কচি

হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, মুখের উপর মুখ দিয়া ডাকিল, "জেথা"। কেনারাম রাগ, তাপ, দুঃখ, যন্ত্রণা সমস্ত ভুলিয়া গোপালের মুখ-চুম্বন করিল।

গভীর রাত্রিকালে বাটীর দ্বার খুলিয়া হরিশ বাহিরে আসিল। তাহার বুকের ভিতর ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল, প্রতিশোধপিপাসায় আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল। সে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া ধীরে ধীরে কেনারামের শয়নকক্ষের পশ্চাতে দাঁড়াইল। তারপর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে দেশালাই বাহির করিয়া জ্বালিল, কম্পিত হস্তে সেই জ্বলন্ত দেশালাই ঘরের চালের নিকট ধরিল। খড়ের চাল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হরিশ একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে আপনার বাটীতে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত চালটা ধরিয়া উঠিল। অন্ধকার গগনে অগ্নির করাল শিখা উঠিয়া গ্রামখানাকে সহসা আলোকিত করিল। সে আলোকে সুখ-সুপ্ত গ্রামবাসিগণ চমকিত হইল, চারিদিকে একটা 'গেল গেল' শব্দ উঠিল। অনেক লোক আসিয়া কেনারামের বাটীর নিকট সমবেত হইল। কেনারাম বড় বৌকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিল; সমস্ত জিনিষ পত্রের সহিত ঘরখানা পুড়িতে লাগিল। অনেকে অগ্নি-নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তখন

বাড়ীর চারিদিক ধরিয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে প্রবল বায়ু বহিল। অগ্নির একটা শিখা ছুটিয়া গিয়া হরিশের গৃহের চালের উপর পড়িল। সে গৃহখানাও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সকলেই সেই দিকে ছুটিল।

হরিশ পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে পারিত। কিন্তু পাপীর মনে অনেক ভয়। কোথা হইতে একটা অজ্ঞাত ভীতি আসিয়া তাহার হৃদয় চাপিয়া ধরিল, সে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই ভয়ের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টিত হইল। তারপর মুহূর্ত্ত পরেই মাথার উপর অগ্নির করাল শিখা দেখিয়া সে আপনার রাগের পরিণাম বুঝিতে পারিল, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। পত্নী, পুত্র, সম্পত্তি সমস্তই জ্বলন্ত বহ্নির করাল গ্রাস মধ্যে পড়িয়া রহিল। ক্ষণ মধ্যেই সমস্ত বাড়ীখানা বেড়িয়া ভীম গর্জ্জনে অগ্নির রক্তশিখা নাচিতে লাগিল। গৃহমধ্য হইতে একটা করুণ আর্ত্তনাদ উঠিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু কেহই সেই অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না, সকলেই হতবুদ্ধি ভাবে দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ অগ্নিক্রীড়া দেখিতে লাগিল। দুইটা রমণী একটা শিশুর সহিত জীবন্ত দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। হরিশ স্তম্ভিত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া এই পৈশাচিক দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

সহসা কে ও ছুটিয়া আসিয়া ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করে? সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, সে কেনারাম। কেনারাম বেগে সেই অনলরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নির লোল জিহ্বা নাচিতে লাগিল। সকলেই হায় হায় করিয়া উঠিল। নিমেষ মধ্যেই গোপালকে বক্ষে চাপিয়া, ছোট বোয়ের অর্দ্ধদগ্ধ অচেতন দেহ কক্ষে লইয়া অগ্নিরাশির মধ্য হইতে কেনারাম বাহিরে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের জ্বলন্ত চালটা ভাঙ্গিয়া দ্বারের উপর পড়িল। কেনারামের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া সকলে আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠিল। কেনারাম বাহিরে আসিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

(৭)

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভস্মে পরিণত করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। তখন কেনারামের চৈতন্য হইয়াছে, সে গোপালকে বুকে লইয়া বসিয়াছে। পার্শ্বে ছোট বোয়ের অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার শিয়রে বসিয়া বড় বৌ কাঁদিতেছে। সমবেত জনমণ্ডলী নীরবে দাঁড়াইয়া এই করুণ দৃশ্য দেখিতেছে। সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শব্দ উঠিল, "দাদা!" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হরিশ আসিয়া কেনারামের পায়ের উপর আছাড়িয়া পড়িল। কেনারাম

একহস্তে গোপালকে ধরিয়া, অন্য হস্তে হরিশকে টানিয়া বুকের উপর তুলিল। বহু দিনের পর দাদার স্নেহপূর্ণ বুকে মাথা রাখিয়া হরিশ কাঁদিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কেনারামও বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল। সে দৃশ্য দেখিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

তারপর সেই ভস্মস্তূপ পরিষ্কার করিবার সময় একটী দগ্ধপ্রায় কঙ্কাল বাহির হইল। সকলেই চিনিল, সে কঙ্কাল হরিশের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর।

* * * * *

দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগ্রত লোকের মনে যেমন দৃষ্ট স্বপ্নের একটী ছায়া মাত্র থাকে, তেমনই কেনারামের, বড়বোয়ের এবং হরিশের হৃদয়ে একটী ক্ষীণ ছায়া মাত্র রাখিয়া অতীতের ঘটনানিচয় একে একে মুছিয়া গেল। হরিশ আবার দাদার, বড়বোয়ের স্নেহ-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল। যে একটী ক্ষুদ্র বালির বাঁধ সেই স্রোতোবেগকে এতদিন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভগ্ন হওয়ায় অবরুদ্ধ স্রোত আবার প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। কেবল সেই বালির বাঁধের একটী ক্ষুদ্র দাগ রহিল—গোপাল।

মধুসূদনের দুর্গোৎসব।

(১)

মহালয়া অমাবস্যার শেষ রাত্রিতে মধুসূদন স্বপ্ন দেখিলেন, যেন স্বয়ং ভগবতী আসিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "মধু! আমি তোর ঘরে আসিব।" মধুসূদনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত —ঘর্ম্মাপ্লুত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঘরের চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, শারদীয় উষার শান্ত-আলোকরশ্মি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। রায় বাবুদিগের বাটী হইতে নহবতের ললিতসুর উঠিতেছে; শানাইটা গলা ছাড়িয়া বিভাষে গাহিতেছে;—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।"

মধুসূদন শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। আজি

প্রতিপদের শান্ত প্রভাতটা তাঁহার দৃষ্টিতে বড়ই সুন্দর—বড়ই মনোহর বোধ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া, গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া নবীন ছুতারের * বাটীতে গেলেন। অবিলম্বে নবীন আসিয়া কাঠাম বাঁধিতে বসিল। মধুসূদনের গৃহিণী দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা ব্যাপারটা কি ?"

মধুসূদন একগাল হাসিয়া বলিলেন, "ছোট বৌ ! মা আসিবেন।"

ছোটবৌ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ নাকি ?"

মধুসূদন বলিলেন, "না ছোটবৌ ! ক্ষেপি আপনিই আসিতেছেন।"

মধুসূদন চুপি চুপি স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। শুনিয়া ছোট বোয়ের রোমাঞ্চ হইল। বলিল, "কিন্তু কিসে কি হইবে ?"

মধুসূদন বলিলেন, "সে কথা মা-ই জানেন।"

ছোটবৌ বলিল, "তবু পাঁচ জনের পাতেও তো ভাত দিতে হ'বে ?"

* মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি জেলায় অনেক স্থানে সূত্রধর জাতিই প্রতিমা নির্ম্মাণ করে।

মধুসূদন বলিলেন, "তা হ'বে বৈকি। ঘরে কতগুলি ধান আছে ?"

ছোটবৌ বলিল, "কুড়ি সাতেক (প্রায় দুই মণ) হবে।"

মধুসূদন বলিলেন, "তারই কিছু পূজার আলো চালের জন্য বাকী সিদ্ধচালের জন্য দাও।"

গৃহিণী চলিয়া গেল। মধুসূদন চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া যজমান বাড়ীর অভিমুখে চলিলেন।

(২)

মধুসূদন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গ্রামের মধ্যে পাঁচ ছয় ঘর যজমান আছে, তাহার আয়েই কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলে। ইহা ব্যতীত পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর পাঁচ বিঘা সাড়ে সাত কাঠা ধান জমি আছে। কিন্তু গত বৎসর নূতন জরিপের সময় তাহার দুই বিঘা জমি নায়েব মহাশয় মালভুক্ত করিয়াছেন। অবশিষ্ট জমি ভাগে প্রজাবিলী আছে। মধুসূদনের বিদ্যাশিক্ষা ভাল হয় নাই। তিনি এক বৎসর মাত্র বাচস্পতি মহাশয়ের টোলে সংক্ষিপ্তসারের কপেক পাত উল্টাইয়াছিলেন। তবে তাঁহার স্বভাবটি বড় নম্র, বড় উদার ছিল। এজন্য গ্রামের অনেকেই এই বিদ্যাশূন্য আড়ম্বরবিহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ভক্তি ও ভালবাসার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। মধুসূদনের সন্তানসন্ততির মধ্যে একমাত্র কন্যা উমা।

ঘোষপুরের বনিয়াদী বড়লোক শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত উমার বিবাহ হইয়াছে। উমা যেমন সুন্দরী, তেমনই ভাল ঘরে পড়িয়াছে। এখন সংসারে কেবল মধুসূদন এবং তাঁহার গৃহিণী M

মধুসূদন যজমান বাড়ীতে গিয়া সকলকে মার আগমনের শুভ সংবাদ জানাইলেন। এ সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধগণ আনন্দিত হইল, যুবকদল মুখ বাঁকাইল। কারণ তাঁহারা শিক্ষিত, সুতরাং এরূপ স্থলে সাহায্যার্থ বাজে খরচের সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে মধুসূদনের ভাগ্যক্রমে গ্রামে এরূপ যুবকের সংখ্যা অল্পই ছিল। কারণ তাঁহারা প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়া-পীড়িত জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া সস্ত্রীক কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন। কেবল মৃত্যুভয়রহিত বৃদ্ধেরাই তখনও বাস্তুভিটা জাগাইয়া বসিয়াছিল। যাহাই হউক, মধুসূদনকে একেবারে বিফল-মনোরথ হইতে হইল না; প্রায় সকলের নিকটই অল্প বিস্তর সাহায্যের আশা পাইলেন।

ঘুরিয়া ফিরিয়া মধ্যাহ্নকালে মধুসূদন বাড়ী আসিলেন। আহারান্তে গৃহিণীকে বলিলেন, "উমিকে আনতে হবে কি?"

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ওমা বল কি গো, মেয়েকে আনবে না? পূজো বাড়ী সাজবে কেন? আর এত কাজই বা করবে কে? আমি একা কি সব পেরে উঠবো?"

মধুসূদন বলিলেন, "তাতো বটেই, তবে এখন তা'রা পাঠালে হয়।"

গৃহিণী বলিল,"ঘরে মা আসছেন, আর মেয়ে পাঠাবে না, তাও কি হয়?"

মধুসূদন সেই দিনই ঘোষপুর যাত্রা করিলেন, এবং বেহাই ও বেহানকে অনেক বলিয়া কহিয়া, পরদিন উমাকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। কথা রহিল, বিজয়ার পরদিনই উমাকে রাখিয়া আসিতে হইবে। কারণ পূজার ছুটিতে জামাই বাড়ীতে আসিতেছেন।

(৩)

মধুসূদনের পূজার কথাটা ক্রমে পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রথমে কেহই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তারপর যখন মধুসূদনের ছোটো চণ্ডীমণ্ডপটীতে নবীনকে প্রতিমার গায়ে কাদা মাখাইতে দেখিল, তখন অগত্যা সকলকে এমন অসম্ভব কথাটার উপরও জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে হইল। তবে তাহারা স্থির করিল যে, নিশ্চয়ই মধুসূদনের মাথাটা রায়বাবুদের বাটীর বাজনার শব্দে গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, বড় পুকুরে যে যক (যক্ষ) আছে, মধুসূদন রাতারাতি তাহার সব টাকার ঘড়াগুলা পাইয়াছে। সকলেই ব্যগ্রচিত্তে এই পূজার

পরিণাম দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিল। এজন্য যে অনেকেই অনিদ্রা ও অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, এরূপও শুনা যায়। পাড়ার অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া ছোটবৌকে নানাবিধ প্রশ্ন করিত; কত লোক খাইবে, কতগুলি চাল তৈয়ারি হইল, দধি সন্দেশের বায়না কিরূপ দেওয়া হইয়াছে, ইত্যাদি শ্লেষপূর্ণ বিবিধ প্রশ্ন তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিত। ছোটবৌ যথাসম্ভব বিনয় সহকারে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিত। সকলেই ক্ষুণ্ণ মনে বাটী প্রত্যাগমন করিত।

মধুসূদন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যজমানেরা যে যেরূপ পারিল, অর্থ সাহায্য করিল; যে না পারিল, সে অন্য কোনরূপে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। ইহা ব্যতীত রায়বাবুরা বড় পুকুর হইতে মাছ ধরাইয়া লইতে আদেশ করিলেন, ধানের মহাজন পালবুড়ো কিছু ধান দিল, হারুমাঝি গাছের এক কাঁদি কলা কাটিয়া দিল, ধনী গোয়ালিনী দশসের দধি দিবে বলিল, বেণী ময়রা পাঁচসের সন্দেশ দিতে স্বীকার করিল। এইরূপে মধুসূদন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত এক প্রকার ঠিক করিয়া ফেলিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেন, কোন স্থানে বিফল-মনোরথ হইলে হৃদয়টা যখন ভাঙ্গিয়া পড়িত, তখন আসিয়া একবার সেই অসজ্জিতা

প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইতেন। অমনই তাঁহার ক্লান্ত হৃদয়ে আনন্দের একটী মধুর হিল্লোল বহিয়া যাইত; দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বুক বাঁধিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আবার মাতৃপূজার আয়োজনে ব্যস্ত হইতেন।

এদিকে পাড়ার যত ছেলে আসিয়া মধুসূদনের বাটীতে আড্ডা করিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষুদ্র বাটীটী বালকগণের হর্ষকল্লোলে মুখরিত হইতে লাগিল। পাঠশালার ছুটী হইলেই দলে দলে বালকগণ বই বগলে করিয়া ঠাকুর দেখিতে ছুটিত। কখনও বা তাহাদের মধ্যে দুইটা দল হইত। একদল বলিত, রায়দের ঠাকুর ভাল, অপর দল বলিত, চক্রবর্ত্তীর ঠাকুর ভাল। শেষে তাহাদের এই সমালোচনার পরিণামে গালাগালি মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। কেহ বা নবীনকে তামাক সাজিয়া দিয়া তাহার রঙের চুপড়ী হইতে একটু রঙ সরাইবার অবসর খুঁজিত। তাহাদের বালক-সুলভ হাস্য চীৎকারে বাড়ীখানির মধ্যে যেন একটী মহোৎসবের আনন্দ-কল্লোল ছড়াইয়া পড়িত। ছোটবৌ এক একবার বাহিরে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিত, আর আনন্দে তাহার হৃদয়খানি ফুলিয়া উঠিত।

দেখিতে দেখিতে পঞ্চমীর রাত্রি কাটিয়া গেল। মধুসূদন চারিদিক হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজন মত জিনিষ পত্র

আনিতে লাগিলেন, ছোট বৌ ও উমা উভয়ে মিলিয়া তাহা গুছাইতে ব্যস্ত হইল। যথাসম্ভব লোকজন নিমন্ত্রিত হইল। দেখিয়া শুনিয়া পাড়ার সকলে অবাক হইল। তবে মধুসূদনের বড় ভাই যদুনাথ বহু গবেষণার পর অনেকের নিকট, বিশেষতঃ বড় বোয়ের কাছে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এ "কাঠ বিড়ালীর সাগর বন্ধন। পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।" তাঁহার এই মন্তব্য প্রকাশের যে কোন বিশেষ কারণ ছিল না তাহা নহে। বড় বৌ অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিল যে, "ঠাকুর পো খেতে পায় না, সে পূজো আনলে, আর তুমি এতদিন বাবুদের বাড়ী চাকরী করেও কিছু করতে পারলে না?" অবশ্য যদুনাথ পৃথকান্ন। ইহার উপর ছোট বৌ মাঝে মাঝে আসিয়া যখন বড় বৌকে পূজা বাড়ীতে পদার্পণ করিতে এবং কাজকর্ম্ম দেখিতে শুনিতে অনুরোধ করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও বড় বোয়ের অন্তরটা গুমরিয়া উঠিত, ক্রোধে ক্ষোভে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইত। সে ভাবিত, ছোট বোয়ের এই হাসিমাখা আহ্বান ও অনুরোধের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অহঙ্কার ও শ্লেষ লুক্কায়িত আছে। এই জন্যই বড় বৌ স্বামীকে বলিয়াছিল, "তুমি পাত পাড়তে যাও যাবে, আমি তো ও ভিটায় পা দেব না। উমির যে অহঙ্কার! হলেই বা বড় লোকের বউ।"

পত্নীর কথার উত্তরে যদুনাথ কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই, তবে তাহা যে পত্নীর মতের প্রতিকূল নহে, ইহা নিশ্চয়। কেন না পূজার তিনদিন যদুনাথকে বাড়ীতে দেখা যায় নাই। শুনা যায়, তিনি নাকি এ কয়দিন রায়বাবুদের পূজা বাটীতে দিন রাত খাটিয়া আপনার সহৃদয়তা ও পরোপকারপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। আর বড়বৌ পেটের বেদনায় শয্যা ত্যাগ করিতে পারে নাই; সে এ কয়দিন কেবল রাত্রি কালে হরিশের আনীত খাদ্যগুলি খাইয়াই অতি কষ্টে দিন কাটাইয়াছিল।

(৪)

ষষ্ঠীর প্রভাতে মধুসূদন কল্পারম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাকালে একটা ঢাক আসিয়া বাড়ী খানাকে সরগরম করিয়া তুলিল। নূতন কাপড় পরিয়া ছেলের দল ঠাকুর সাজান দেখিতে ছুটিল। সন্ধ্যার পর মধুসূদন বিল্বমূলে দেবীর বোধন করিলেন। আবাহনের মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে করিতে মধুসূদন আত্মহারা হইলেন। সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য না হইলেও তাহাই যেন তাঁহার তৃষিত হৃদয়ে কোন্ স্বর্গের অমৃতধারা ঢালিয়া দিতে লাগিল, আনন্দ-মিশ্রিত ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া আসিল—চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

অনেক রাত্রিতে ঠাকুর সাজান শেষ হইল। মধুসূদন

চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে প্রতিমার সম্মুখে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সেই সজ্জঃ-সজ্জিতা দেবী প্রতিমা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "মধু! বলি চাই।"

স্বপ্নঘোরেই মধুসূদন বলিলেন, "আমি যে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত মা!"

দেবী বলিলেন, "আমিও যে বৈষ্ণবী।"

মধুসূদন বলিলেন, "কিন্তু মা, বলিদান যে আমার কুল-প্রথা নয়?"

দেবী বলিলেন, "তা হইবে না মধু! বলি চাই। শীঘ্র বলির চেষ্টা কর, বেলা হইল উঠ।"

মধুসূদন কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কাহার অঙ্গ-স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিলেন, ছোটবৌ তাঁহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে বলিতেছে, "বেলা হ'লো উঠ, উঠ।"

মধুসূদন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে শান্তোজ্জ্বলরূপিণী সজ্জিতা দেবীপ্রতিমা। দেবীর অলক্তক-রঞ্জিত ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে স্নিগ্ধ হাস্যরশ্মি ক্ষরিত হইতেছে। দেবীকে প্রণাম করিয়া মধুসূদন বাহিরে আসিলেন।

(৫)

সপ্তমী পূজা শেষ হইল। পূজা শেষে মধুসূদন দেবীর

স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। স্তব পাঠ করিতে করিতে তিনি যেন কোন এক অজ্ঞাত আনন্দময় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল। ভক্তি-সমুদ্বেলিত কণ্ঠে বারবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে! মাহেশ্বরি মদাশ্রয়ম্॥"

তাঁহার উভয় গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল।

উমার আনন্দের সীমা নাই। সে চেলীর কাপড়ের আঁচলখানা কোমরে জড়াইয়া,চুলগুলাকে মাথার সম্মুখ দিকে ঝুঁটি বাঁধিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, বিরাম নাই। সে একবার পূজার কাছে ছুটিতেছে, আবার আসিয়া সমাগত বালকবালিকা-গণকে মুড়িমুড়কী বিতরণ করিতেছে, কখন বা রন্ধন-শালায় ছুটিয়া যাইতেছে; যেন একটী আনন্দ-প্রতিমা আনন্দ-ময়ীর কতকটা আনন্দধারা হৃদয়ে লইয়া তাহা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিতেছে। ছোট বৌ রন্ধনশালা হইতে এক একবার এই দৃশ্য দেখিতেছে, আর ভাবিতেছে, "যাহার উমা আছে, তাহারই পূজা সার্থক।" আর মধুসূদন দেখিতেছেন, একটী উমা যেন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আজি তাঁহার গৃহে

আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি এক একবার প্রতিমার দিকে চাহিতেছেন, আরবার অতৃপ্ত নয়নে উমার স্বেদবিন্দুশোভিত প্রফুল্ল মুখখানি দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয়ে স্নেহমিশ্রিত ভক্তির প্রবাহ তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে।

অন্তরাল হইতে বড়বৌ এক একবার উমার দিকে চাহিতেছে, আর মনে মনে বলিতেছে, মা যদি সত্য হয়, তবে এত অহঙ্কার থাক্‌বে না, থাক্‌বে না।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক খাওয়ান হইল। অতিথি অভ্যাগত সকলেই পরিতোষ সহকারে ভোজন করিল। সকলেই বলিল, এমন পরিতৃপ্তির সহিত আহার রাজবাড়ীতেও হয় নাই। মার দৃষ্টি না হইলে এমন হয় না। রায় বাবুদের বাটীতে নিমন্ত্রণ থাকিলেও এবং তথায় অত্যুত্তম খাদ্যাদির বন্দোবস্ত হইলেও ইহার পর দুইদিন অনেকেই মধুসূদনের বাটীর আহার ছাড়িয়া সেখানে যায় নাই।

তাই বলিয়া মধুসূদন যে এত উৎকৃষ্ট ও প্রচুর সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তবে উমার হাতের গুণেই হউক বা তাঁহার ভক্তিমিশ্রণেই হউক, সেই সকল সামান্য সামগ্রীতেই লোকে অমৃতের আস্বাদ পাইল। মধুসূদন একশত লোকের আয়োজন করিয়া দুইশত লোক খাওয়াইলেন, তথাপি ভাণ্ডার শূন্য হইল না।

সন্ধ্যার পর বৃদ্ধ রায় মহাশয় স্বয়ং নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। তিনি অনেকক্ষণ প্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "চক্রবর্ত্তি! তোমার পূজাই সার্থক! আমাদের অর্থব্যয়ই সার।"

(৬)

অষ্টমী পূজা শেষ হইল। দিবসেই সন্ধিপূজা, তাহাও সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যাকালে আরতির সময় মধুসূদন দেখিলেন, দেবীর প্রফুল্ল বদনমণ্ডল যেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়াছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল।

অষ্টমীর শেষ রাত্রিতে উমার দুইবার ভেদ ও বমন হইল। সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। প্রভাতে ছোটবৌ ডাক্তার ডাকিবার জন্য মধুসূদনকে বলিল। কিন্তু মহেশপুরে ডাক্তার ছিল না। প্রায় এক ক্রোশ দূরে গোপালগঞ্জগ্রামে একজন ভাল ডাক্তার ছিল। কিন্তু কে ডাক্তার ডাকিতে যায়? মধুসূদন পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। তিনি বলিলেন, "ডাক্তার আনিতে গেলে মায়ের পূজা হইবে না।"

ছোটবৌ বলিল "তবে কি হবে?"

মধুসূদন বলিলেন, "মা যা করিবেন, তাহাই হবে।"

মধুসূদন দেবীর চরণামৃত আনিয়া উমাকে খাওয়াইয়া দিলেন। কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ছোট-

বৌ কন্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার রোগক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। মধুসূদন নবমী পূজা শেষ করিয়া কাতর-কণ্ঠে মায়ের নিকট উমার প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

উদ্বেগে—আশঙ্কায় নবমীর দিন কাটিয়া গেল।

সান্ধ্য আরতি শেষে মধুসূদন আবার উমাকে দেবীর চরণামৃত খাওয়াইয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর হইতেই আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। যেন কোন নিরানন্দের রাজ্য হইতে একটা গাঢ় অন্ধকার আসিয়া নবমীর বিষাদ যামিনীকে আরও বিষণ্ণ করিয়া তুলিল। প্রকৃতি স্থির নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে মধুসূদন যেন মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বসূচনা দেখিতে পাইলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল—যে রাত্রিতে গিরিরাণী প্রাণের উমাকে বিদায় দিতে হইবে বলিয়া সকাতরে তাহার করুণা ভিক্ষা করিয়াছিলেন—নবমীর সেই কালরাত্রি আসিল। সেই কাল রজনীতে যখন মধ্যযামের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রায় বাবুদের বাটীতে নহবতের শানাইটা বেহাগের করুণ-রাগিণীতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতে-ছিল,—"কেমন ক'রে রব ঘরে বলে যা' মা হেমবরণি!" সেই সময়ে মধুসূদনের বাটী হইতে ক্রন্দনের উচ্চরোল উঠিল। উমা চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিল। কয়েকজন প্রতিবাসী ছুটিয়া আসিল। তাহারা ছোটবোয়ের কোল হইতে

উমার মৃতদেহ টানিয়া লইয়া উঠানে নামাইল। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। বড়বৌ প্রাচীরের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, "আহা, কি পূজাই করলে ঠাকুরপো, কি রাক্ষসীকে ঘরে আন্‌লে? মাটীর ঠাকুর ঘরে এনে এমন সোণার প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিলে?" বড়বৌ অঞ্চলে শুষ্ক চক্ষু মুছিল। মধুসূদন তীব্র কটাক্ষে একবার তাহার পানে চাহিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে ছুটিলেন।

(৭)

দেবীর সম্মুখে একটী মাত্র আলোক জ্বলিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে নিস্তব্ধ চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে দেবীপ্রতিমা যেন থম্ থম্ করিতেছিল। মধুসূদন ছুটিয়া আসিয়া দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন; উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি করিলি মা!"

মধুসূদন শুনিতে পাইলেন, সহসা দেবী যেন ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "বলি কোথায়?"

মধুসূদন স্থির দৃষ্টিতে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এত থাকিতে উমাই কি তোর বলি হইল মা?"

উত্তর আসিল, "হাঁ।"

মধুসূদন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তবে তাই হোক্—ইচ্ছাময়ি! তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।"

তখন সেই বায়ু-কম্পিত ক্ষীণালোক মধ্যে সহসা যেন

প্রতিমা নড়িয়া উঠিল। মধুসূদন স্তম্ভিত হৃদয়ে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রতিমা যেন সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন, "মধু!"

কি মধুর স্বর! এমন স্বর মধুসূদন জীবনে আর কখনও শুনেন নাই। সে মধুর অলৌকিক স্বর তাঁহার হৃদয়ের প্রতি গ্রামে যেন একটী সুধাস্রোত প্রবাহিত করাইয়া প্রতি-ধ্বনি তুলিতে লাগিল, "মধু! মধু!" মধুসূদন বিস্ময়ে—ভক্তিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন; রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "মা! মা!"

"বাবা!" উত্তর আসিল, "বাবা!"

মধুসূদন বিস্মিত স্তম্ভিত দৃষ্টিতে দেখিলেন, দেবীমূর্ত্তি ক্রমে উমামূর্ত্তিতে পরিণত হইল। মধুসূদনের দৃষ্টিতে পলক নাই, বক্ষে স্পন্দন নাই, বিস্ময়ের—আনন্দের সীমা নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এক আনন্দরূপিণী উমা ছাড়া যেন আর কিছুই নাই। সেই অনন্তে অনন্তরূপিণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মধুসূদন আবার ভক্তিবিকম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকি-লেন,—"মা! মা!"

আবার—আবার যেন কোন্ অমৃত ধাম হইতে অমৃত-নিষ্যন্দী কণ্ঠে কে উত্তর দিল,—"বাবা!"

এমন সময় ছোটবৌ আসিয়া সেইখানে আছাড়িয়া পড়িল; চীৎকার করিয়া বলিল, "রাক্ষসি! আমার উমা কোথায়?"

মধুসূদনের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল; মূর্ত্তিও অন্তর্হিত হইল। মধুসূদন, ছোট বোয়ের হাত ধরিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "ছিঃ, কেঁদনা, উমা আছে।"

* * *

দশমীর অপরাহ্নে প্রতিমার সহিত উমাকে বিসর্জ্জন দিয়া মধুসূদন গৃহে ফিরিলেন। ঢাকটা একবার 'মাগো' 'মাগো' শব্দে কাঁদিয়া উঠিয়া চুপ করিল। মধুসূদন নীরবে অশ্রু মুছিয়া গৃহে আসিলেন। ছোটবৌ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, আমার উমাকে কোথায় রেখে এলে?"

মধুসূদন ধীরস্বরে বলিলেন, "উমা শ্বশুর বাড়ী গেছে, একবৎসর পরে আবার আস্‌বে।"

কুড়ুনী।

(১)

অধিক দিনের কথা নয়। সে বৎসরও এমনই দুর্ভিক্ষ, এমনই টাকায় ছয় সের চাউল, এমনই বাঙ্গালার ঘরে ঘরে হাহাকার; এমনই বাঙ্গালীর অর্দ্ধাশন, অনশন, শেষে নীরবে চিরাভ্যস্ত মৃত্যুর কবলে আত্মসমর্পণ। সেবারেও বাঙ্গালা সংবাদপত্র মহলে এমনই তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল; ইংরাজি সংবাদপত্রে তাহার প্রতিবাদের সুর উঠিয়াছিল, আর গবর্ণমেণ্ট 'ও কিছু নয়' 'ও কিছু নয়' বলিয়া মৃত্যুভয়-ভীত বাঙ্গালীকে নির্ভয়ে নিঃশব্দে মরণের পথে অগ্রসর হইবার জন্য সাহস দিতেছিলেন।

সেই দুর্ভিক্ষের সময়ে * * * জেলার নিকটবর্ত্তী রূপসী গ্রামে গদাই বাস করিত। গদাই জাতিতে বাগ্দী। এক বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; অন্যের জমীর উপর ছোট কুঁড়েখানি, আর তাহাতে একটী মেটে পাথর, একটি কাণাভাঙ্গা ঘটী এবং দুইটী মাটীর কলসী ছাড়া আর কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল না, পরের

খাটিয়া মজুরী সংগ্রহ ব্যতীত দিনপাতের অন্য উপায় ছিল না। তা' এই কয়টি ছাড়া আর যে কিছু তাহার সংসারে প্রয়োজন বা প্রার্থনীয় আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত একদিনও গদাই ভাবিত না। এই বৃদ্ধা মাতা, এই কুঁড়েখানি, আর এই সুস্থ সবল দেহের একটা অক্লান্ত শক্তি লইয়াই সে এতদিন অনায়াসে নির্ভাবনায় সংসারটি চালাইয়া আসিতেছিল; কিন্তু সহসা কোন্ নিষ্ঠুর দেবতার জলন্ত অভিশাপের মত দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি আসিয়া, তাহার চিন্তাশূন্য জীবনযাত্রার পথে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইল, তাহার চিরনির্ভর হৃদয়ে আশঙ্কার—চিন্তার একটা প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া দিল। সে তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া গদাই আত্মরক্ষার আর কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না।

ফল কথা, আগে মজুরীলব্ধ যে বারটা পয়সায় সংসার চলিয়া যাইত, এখন আর তাহাতে মাতা পুত্রের অর্দ্ধাশনও হয় না। তা' ছাড়া দূর পল্লীগ্রামে মজুরীও সব দিন জোটে না। সে দিন পুকুরের শুষণী কল্মী শাক, বনকচুর মূল প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু গদাই ছাড়া পল্লীর আরও অনেকে এই সকলের প্রত্যাশা রাখে, সুতরাং সময়ে সময়ে তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। সে দিন—সে দিন অনশন ভিন্ন উপায় নাই। তা' গদাই নিজেন। খাইয়া

দুই দিন কাটাইতে পারে. কিন্তু বৃদ্ধা মাতাকে তো উপবাসী রাখা যায় না? সেদিন গদাই গ্রামের পর গ্রাম, জঙ্গলের পর জঙ্গল ঘুরিয়া মাতার জন্য ফলমূল লতাপাতা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

এ সময়ে গদায়ের মত অবস্থাপন্ন অনেকেই চুরী ডাকাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু গদাই সে পথ অবলম্বন করে নাই।

তা' এত কষ্টেও বাঙ্গালার শান্ত জলবায়ুর গুণে শক্তিশালী গদাই কোন দিনই ধৈর্য্যচ্যুত হয় নাই। অন্য দেশের গদাই এরূপ অবস্থায় কাহার উপর দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া দেয় বলিতে পারি না, কিন্তু অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালার শান্ত গদাই সে বোঝাটা অদৃষ্ট নামক এক অলক্ষ্য দেবতার স্কন্ধে সম্পূর্ণভাবে চাপাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল। সুতরাং পরের ক্ষেতে সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর সে যখন শ্রান্ত দেহ ও ক্ষুধাক্লিষ্ট উদরটা লইয়া গৃহে ফিরিত, তখন অনায়াসেই সমস্ত মাঠটা প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিত,—

বঁধু তোমায় কর্‌বো রাজা তরুর তলে।

এ পর্য্যন্ত গদাইয়ের বিবাহ হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে একবার জনৈক বিধবা প্রতিবাসিনীর কন্যা কুড়ুনীর সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু পণের সাড়ে আট

টাকা যোগাড় হইলেও চারিগাছা কাঁসার মল, দুইগাছা কাঁসার খাড়ু, এবং দুইটা পিত্তলের পাশা সংগ্রহ করিতে না পারায় সে যাত্রা বিবাহ হইল না। যে কুড়ুনীকে বিবাহ করিবার জন্য গদাই বহুদিন হইতে একটা প্রবল আগ্রহ পোষণ করিয়া আসিতেছিল, এবং প্রাণপণ করিয়া পণের টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল, পাড়ারই আর এক জনের সহিত সেই কুড়ুনীর বিবাহ হইয়া গেল। সে আজ প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা। তারপর গদায়ের সেই সঞ্চিত টাকা কয়টী খরচ হইয়া গেল, বালিকা কুড়ুনী যুবতী হইল, শেষে বিধবা সাজিয়া মার কাছে আসিল, এবং ঘুঁটে বেচিয়া মাছ ধরিয়া জীবিকাপাত করিতে লাগিল। কেহ কেহ কুড়ুনীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পরামর্শ দিল, কিন্তু কেন জানি না, কুড়ুনী তাহাতে মত দিল না। গদাইও এ জীবনে বিবাহ অসম্ভব বুঝিয়া হাল ছাড়িয়া দিল। তথাপি সে এখনও মাঠ হইতে প্রত্যাগমন কালে, জানিনা কি আশায়, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে গাহিত,—

বঁধু তোমায় কোর্‌বো রাজা তরুর তলে।

তাহার সেই আশাপূর্ণ আবেগ-বিজড়িত গানটী শুনিবার জন্য মাঠের ধারে তালপুকুরের ভাঙ্গা ঘাটটীতে বসিয়া কেহ অপেক্ষা করিত কি?

(২)

কুড়ুনী ডাকিল,—"আয় গদাই, হাটে যাই।"

গদাই উত্তর করিল, "কি নিয়ে হাটে যাব ?"

কু। আমি ঘুঁটে নিয়ে যাব, আর তুই কাঠ নিয়ে যাবি।

গ। কাঠ কোথায় ?

কু। বনে।

গ। এর পর কাঠ ভেঙে কি হাটে যাবার বেলা থাক্‌বে ?

কু। কেন থাক্‌বে না ? দুজনে ভাঙ্‌লে একদণ্ডে কত কাঠ হবে।

গ। তুই আমাকে কাঠ ভেঙে দিবি ?

কু। তা' না হ'লে তোকে ডাক্‌ছি কেন ? আমি কি হাটের রাস্তা চিনি না ?

গদাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"তা' বটে, কিন্তু কড়ুনী, আমার জন্য তুই এতটা—"

বাধা দিয়া কুড়ুনী বলিল,—"বেলা হ'লো, বেরিয়ে আয়। কাল তোর খাওয়া হয় নি ?"

গ। কে বললে ?

কু। আমি জানি, তা, কি করবো ভাই !—

কথাটা কুড়ুনীর মুখে বাধিয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি কথাটায় চাপা দিয়া বলিল,—"শীগ্‌গীর বেরিয়ে আয়।"

গদাই বুঝিতে পারিল, তাহার মত কুড়ুনীরও কাল উপবাসে গিয়াছে। সে আর কোন কথা না বলিয়া একখানা দা হাতে লইয়া বাহির হইল।

তোমরা শুনিয়া থাকিবে, গোবরেও পদ্মফুল ফুটে। তা' কুড়ুনী ঠিক পদ্মফুল না হইলেও যে অপরাজিতা বা কাঠ-মল্লিকা প্রভৃতির অন্তর্গত নহে ইহা নিশ্চয়। নীচ শ্রেণীর মধ্যে এমন মেয়ে কচিৎ দুই 'একটা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং স্বাস্থ্য ও যৌবনপূর্ণ সুগোল দেহখানার টল্‌টলে সৌন্দর্য্য লইয়া কুড়ুনী যখন একা হাটে মাঠে যাইত, তখন পল্লীবাসী অনেক নিকর্ম্মা ভদ্রসন্তানের মাথা কিছুতেই ঠিক থাকিত না। কিন্তু কুড়ুনী বড় শক্ত মেয়ে। সে অসহায়া হইলেও আপনার হৃদয়ের বলে আপনার ধর্ম্মটুকু বজায় রাখিয়া নির্ভয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করিত। তাহার সে সাহসিকতার নিকট—সে গর্ব্বের সম্মুখে অগ্রসর হইতে কেহই সাহসী হইত না।

(৩)

অপরাহ্ণকালে গদাই ও কুড়ুনী হাট হইতে ফিরিতেছিল। একটা ছোট বনের পাশ দিয়া রাস্তা। অপরাহ্ণের শান্ত সূর্য্যকিরণ শ্যামপত্রাচ্ছাদিত বনশীর্ষে প্রতিফলিত হইতেছিল; বনফুলের গন্ধমাখা একটা উদার বায়ুপ্রবাহ মাঠের

উপর ছুটাছুটী করিতেছিল; পথের পাশে বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় বসিয়া একটা পাখী দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছিল, 'চোক গেল' 'চোক গেল'। আর গদাই আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল,—

বঁধু তোমায় কোরমো রাজা তরুর তলে।

সহসা দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া শব্দ উঠিল, গুড়ুম্। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্বলন্ত গুলি আসিয়া গদায়ের বাম পার্শ্বে বিদ্ধ হইল। চীৎকার করিয়া গদাই পড়িয়া গেল। কুড়ানী একটু পাছু পড়িয়াছিল; সে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, গদাই মূর্চ্ছিত হইয়াছে, তাহার গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থান হইতে তীরবেগে রক্ত ছুটিতেছে, সে রক্তে পথ কর্দ্দমিত হইতেছে। কুড়ানী কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না; সে কেবল উচ্চ চীৎকারে পথ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

এমন সময় কুড়ানী দেখিল, বনের পাশ হইতে সুন্দরপুরের কুঠীর অধ্যক্ষ ডন সাহেব বন্দুক হস্তে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। সাহেবের পশ্চাতে একজন চাপরাসী। ক্রমে সাহেব নিকটে আসিলেন, গদায়ের নিকট আসিয়া এক বার দাঁড়াইলেন, একবার মুখ নামাইয়া তাহার ক্ষতস্থান দেখিলেন; তার পর "Oh, curius mistake" বলিয়া

গমনোদ্যত হইলেন। কুড়ুনী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"সাহেব, সাহেব, গদাইকে বাঁচাও।"

সাহেব একবার তীব্র কটাক্ষে কুড়ুনীর দিকে চাহিলেন; তারপর সবলে পা ছিনাইয়া লইয়া সগর্ব্ব-পদক্ষেপে পথ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কুড়ুনী স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সাহেব চলিয়া গেলে কুড়ুনী উঠিয়া গদায়ের নিকট আসিল। সে বুঝিল এ সময় কেবল কাঁদিলে বা ভাবিলে কোনই ফল হইবে না, যেরূপে হউক, গদাইকে বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইবে। সেখান হইতে রূপসী গ্রাম আধ-ক্রোশের বেশী হইবে না। কুড়ুনী আপনার পরিধেয় বস্ত্রের আধখানা ছিঁড়িয়া নিকটস্থ খালের জলে ভিজাইয়া আনিল। গদাইয়ের মুখে চোখে জল দিল, কিন্তু মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। তখন সে সেই ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ক্ষত স্থান বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাতে রক্তস্রাব কিছু কমিল। এবার সে সাহায্যের আশায় একবার চারিদিকে চাহিল। কিন্তু কেহ কোথাও নাই। একপার্শ্বে জনশূন্য বিশাল প্রান্তর, অপর পার্শ্বে নীরব অরণ্য, সম্মুখে পশ্চাতে নির্জ্জন পথ। কুড়ুনী কাপড়টা আঁটিয়া পরিল, তারপর উভয় হস্তে গদায়ের মূর্চ্ছিত

দেহটা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে কাঁধে তুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু একবার, দুইবার চেষ্টা করিয়াও তাহা তুলিতে পারিল না। ক্ষোভে, দুঃখে ও নিরাশায় সে কাঁদিতে লাগিল।

একটু কাঁদিয়াই কুড়ুনী চক্ষু মুছিল, দন্তে ওষ্ঠ নিষ্পেষিত করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় হৃদয় বাঁধিল; আর একবার আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া গদাইকে তুলিতে চেষ্টা করিল। এবার চেষ্টা সফল হইল। তখন সে গদায়ের মূর্চ্ছিত দেহ কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিল।

(৪)

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। গদায়ের বৃদ্ধা মাতা অনাহারে বসিয়া পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় গদাইকে স্কন্ধে লইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে কুড়ুনী তথায় উপস্থিত হইল। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া মাটীতে আছাড়িয়া পড়িল। কিন্তু কুড়ুনী সে দিকে লক্ষ্য করিল না। সে একেবারে ঘরের ভিতর গিয়া গদাইকে শোয়াইল; তারপর বাহিরে আসিয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। গ্রামে একজন ভাল ডাক্তার ছিলেন। কুড়ুনীর অনেক কাঁদাকাটায় তিনি আসিলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। গুলি অস্থিভেদ করিয়া ভিতরে গিয়াছে, অজস্র রক্তপাতে জীবনীশক্তি ক্রমেই হ্রাস

হইয়া আসিতেছে। তিনি উপস্থিত মত রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কুড়ুনী কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসিল,—"ডাক্তার বাবু! গদাই বাঁচিবে তো?"

ডাক্তার নীরবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কুড়ুনী গদায়ের শিয়রে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল; বাহিরে বৃদ্ধার চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হইতে থাকিল।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় গদায়ের একবার চৈতন্য হইল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া অতি ক্ষীণস্বরে জল প্রার্থনা করিল। কুড়ুনী তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিল। জলপানান্তে গদাই ক্ষীণস্বরে ডাকিল,—"কুড়ুনী!"

কুড়ুনী সাগ্রহে বলিল,—"কেন গদাই?"

গ। কে আমাকে মেরেছে কুড়ুনী?

কু। কুঠীর বড় সাহেব।

"সাহেব" বলিয়া গদাই একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। কুড়ুনী বলিল,—"কেন গদাই?"

গ। সাহেবে মেরেছে, এর আর শোধ নাই।

কু। কোম্পানির মুলুকে একটা খুন ক'রে সাহেব কি পার পাবে?

গ। কোম্পানির আদালতে সাহেবের বিচার নাই—বুঝি দুনিয়াতেও নাই।

কু। তবে কোথায় আছে ?

গদাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কুড়ুনীর মুখের দিকে চাহিল; ক্ষীণ স্বরে বলিল,—"নিজের হাতে। কিন্তু ——"

কুড়ুনী ব্যগ্রভাবে বলিল,—"কিন্তু কি গদাই ?"

গদাই একটু থামিয়া, একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"কিন্তু এ বিচার আর কে করবে ?"

গর্জ্জন করিয়া কুড়ুনী বলিল,—"আমি কর্‌ব।"

গদায়ের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখে একটা আনন্দের জ্যোতি নাচিয়া উঠিল। তারপর আর একটু জলপান করিয়া গদাই—বাঙ্গালার চিরদুঃখী গদাই নীরবে মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিল। কুড়ুনী কাঁদিল না; সে দুই হাতে বুক চাপিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডন্ সাহেব তখন সুন্দরপুরের সুসজ্জিত বাঙ্গালায় বসিয়া পিয়ানোর সহিত মিসেস্ ডনের মিহিস্বরের মধ্যে কিন্নরী-কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনিতেছিলেন।

(৫)

গদায়ের মৃত্যুর কয়েক দিন পরে তাহার মাতা খাইতে না পাইয়া উদ্বন্ধনে নিদারুণ জঠরানল ও শোকানলের তাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। কুড়ুনীর মাতাও নানা রোগে ভুগিয়া চিকিৎসাভাবে পথ্যাভাবে ইহলোক হইতে বিদায়

লইল। মাতার মৃত্যুর পর কুড়ুনী যে কোথায় গেল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। কেবল রেয়াজউদ্দীন মিস্ত্রী একবার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাঙ্‌লা মেরামত করিতে গিয়া দেখিয়াছিল, বাঙ্‌লার ভিতর একজন আয়া সাহেবের বন্দুকটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। রেয়াজউদ্দীনের বোধ হইয়াছিল, সে আয়া যেন কতকটা কুড়ুনীরই মত। কিন্তু সে বয়সের দোষে ভাল চিনিতে পারে নাই।

এক বৎসর পরে কুড়ুনী আবার দেশে ফিরিয়া আসিল।

কুড়ুনী এখন আর সে কুড়ুনী নাই। সে এখন আর গোবর কুড়ায় না, হাটে যায় না, শাক তুলে না। ইচ্ছামত কোন দিন খায়,কোন দিন বা খায় না। এখন কুড়ুনী একা। সে কখন কোথায় যায়, কোথায় থাকে তাহার কিছুই স্থির নাই। লোকে বলে, কুড়ুনী পাগল হইয়াছে, কিন্তু তাহার পাগলের লক্ষণ কিছুই ছিল না। সে হাসিত না, কাঁদিত না, কাহারও নিকট যাইত না, কাহাকেও কোন কথা বলিত না। সে একা বসিয়া নীরবে সংসারের উদাস দিনগুলি একে একে গণিয়া যাইত। দিন যাইত, রাত্রি আসিত; আবার প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা হইত। গোধূলির রক্তিম রাগ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িত, উদাস বায়ুপ্রবাহ ধীরে ধীরে তাহার ভগ্ন কুটীরপ্রাঙ্গণে বহিয়া যাইত, কৃষকগণ মাঠ

হইতে গৃহে ফিরিত, কুন্তুনী নীরবে বসিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিত। তথনও যেন তাহার কাণে একটা আকুল কণ্ঠের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আসিয়া বাজিত,—"তোমায় কোর্‌বো রাজা তরুর তলে।"

(৬)

আবার তেমনই জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ন। আবার তেমনই কাননের শ্যামশীর্ষে রক্তিম সূর্য্যের সোণালি কিরণ নৃত্য করিতেছে; তেমনই বনফুলের গন্ধ মাখিয়া উদাস বায়ু প্রান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তেমনই কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় বসিয়া 'চোক্ গেল' 'চোক গেল' শব্দে একটা পাখী দিগন্ত কম্পিত করিতেছে; তেমনই ডন্ সাহেব চাপরাসী সঙ্গে শিকারে বাহির হইয়াছেন।

অপরাহ্ন সমাগত দেখিয়া সাহেব প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় বনের ভিতর হইতে একটী স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"সাহেব, একটা বাঘ, একটা বাঘ।"

বাঘের নাম শুনিয়া সাহেবের হৃদয় বীরমদে নাচিয়া উঠিল। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কোঠায় বাঘ, কোন্ ডিকে?"

"এই দিকে" বলিয়া স্ত্রীলোক ছুটিল; সাহেবও গুলিভরা বন্দুকহস্তে তাহার পশ্চাৎ ছুটিলেন। চাপরাসী বাঘের নাম

শুনিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই আপনার দীর্ঘ-শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত পাগড়িমণ্ডিত মস্তকটীকে ব্যাঘ্রকবলগত সম্ভাবনা করিয়া জীবনে এই প্রথম আল্লাকে স্মরণ করিতে লাগিল। শেষে সে স্থানে একা দাঁড়াইয়া থাকাও তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল না। কারণ, সাহেবের তাড়া খাইয়া বাঘটা যদি এই দিকে ছুটিয়া আসে? সে তখন ভয়ে ভয়ে সতর্ক পদক্ষেপে যে দিকে সাহেব গিয়াছেন, সেই দিকে চলিল; এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, এবার সে দেশে গিয়া পদ্মায় নৌকায় দাঁড় টানিয়া খাইবে, তথাপি আর কখনও সাহেবের সঙ্গে শিকারে আসিবে না।

এ দিকে কিছু দূর গিয়া স্ত্রীলোকটা থমকিয়া দাঁড়াইল, সাহেবও দাঁড়াইলেন; এবং এই স্থানে কোথাও বাঘ আছে বুঝিয়া চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সহসা স্ত্রীলোকটা উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং তিনি আত্মরক্ষা করিবার পুর্ব্বেই তাঁহার হাত হইতে বন্দুকটা কাড়িয়া লইয়া চারি পাঁচ হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। সাহেব এই নেটিভ রমণীর সাহস ও বিক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং স্তম্ভিতভাবে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। রমণী তখন বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বারা সাহেবের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া কর্কশ স্বরে ডাকিল,—"সাহেব!"

সাহেব বুঝিলেন, রমণী উন্মাদিনী। বলিলেন,—"কে টুমি? কি চাও?"

রমণী গম্ভীর স্বরে বলিল,—"আমি কুড়ুনী, চাই তোমার জান।"

সাহেব বলিলেন,—"হামার জান, কেন হামি টোমার কি করিয়াছে?"

রমণী—কুড়ুনী বলিল,—"কি করেছ মনে নাই সাহেব? আর বৎসর ঠিক্ এমনই দিনে এমনই সময়ে—"

সা। এমন ডিনে এমন সময়ে কি হইয়াছিল?

কু। একটা গরীব লোককে বিনা দোষে এই বন্দুকের গুলিতে খুন করেছিলে।

সা। খুন? টা হইতে পারে। কিণ্টু সে নিমিট্ত, টুমি এখন কি চাও?

কু। আমি চাই তার শোধ—আমি চাই তোমার জান।

সা। জান! টুমি হামাকে খুন করিবে? একটা নেটিভ্ কুলী আড্মীকে হট্যা করিয়াছে, সে নিমিট্ট টুমি হামাকে হট্যা করিটে সাহস পাইটেছে?

কু। কেন সাহেব, নেটিভ্ কি মানুষ নয়?

সা। মানুষ—হইলেও নেটিভ্ কালা আড্মী। টাহার এবং হামার জীবনের মূল্য টুল্য হইতে পারে না।

কু। তোমার অত কথা আমি বুঝি না সাহেব, আমি বুঝি জানের বদলে জান্।

সাহেব একবার চঞ্চল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কিণ্টু হামাকে হট্যা করিলে টোমার কি ডুর্গটি হইবে জান? টোমাকে ফাঁসি যাইটে—"

কুড়ুনী হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি সাহেবের কর্ণে বজ্রবৎ ধ্বনিত হইল। সাহেব দেখিলেন, রমণী সত্য সত্যই বন্দুকের ঘোড়া টিপিবার উদ্যোগ করিতেছে। সাহেব অগ্রসর হইয়া রমণীর হাত হইতে বন্দুকটা কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। কুড়ুনী বজ্রকঠোর কণ্ঠে বলিল,—"সাবধান সাহেব, নড়িলেই গুলি করিব। এই সময় তোমার দেবতাকে ডাক।"

সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইলেন; একটু কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"টুমি হামাকে হট্যা করিও না, হামি [illegible]কে খুব বক্‌শিষ করিবে।"

কুড়ুনী আবার হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে সাহেব যেন মৃত্যুর বিকট অট্টহাস্য শুনিতে পাইলেন। তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—"চাপড়াসি, চাপড়াসি!"

নিস্তব্ধ কানন মথিত করিয়া একটা বিকট প্রতিধ্বনি উত্তর করিল—ই—ই—ই।

প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কানন প্রান্তর কম্পিত করিয়া বন্দুক গর্জ্জিল, 'গুড়ুম' ; শব্দের সহিত একটা জ্বলন্ত গুলি আসিয়া সাহেবের ললাটে বিদ্ধ হইল। ছিন্নমূল পাদপবৎ সাহেব কাননতলে লুটাইয়া পড়িলেন। অন্তিম নিশ্বাসের সহিত একবার তাঁহার মুখ হইতে শেষ উচ্চারিত হইল,—'Oh God !' পর মুহূর্ত্তেই সাহেবের চিরগর্ব্বিত আত্মা মহা-বিচারকের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য কোন্ অজ্ঞাত অনন্তধামে প্রস্থান করিল। বন্দুকের শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাপরাসী আসিয়া দেখিল, সাহেবের প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত, তাঁহার বুকের উপর বন্দুকটা পড়িয়া রহিয়াছে।

ইহার পর আর কেহ কখনও কুড়ুনীকে দেখিতে পায় নাই।

ঠাকুরের অদৃষ্ট।

(১)

মহেশ ঠাকুরের অদৃষ্টটা যে বড় ভাল ছিল না, ইহা গ্রামের সকলেই জানিত; ঠাকুর নিজেও যে তাহা জানিতেন না এরূপ নহে। আর জানিতেন বলিয়াই তিনি এই স্বভাব-কুটিল নিয়তিচক্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার অবাধ গতি প্রতিরোধ করা অসম্ভব বোধে সেরূপ চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। সুতরাং বাধাবিহীন নদী-স্রোতের ন্যায় প্রতি স্পর্দ্ধী-বিরহিত অদৃষ্টচক্রটা অপ্রতিহত বেগে এই নিরীহ ব্রাহ্মণের অগ্রে অগ্রে আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিতেছিল; আর ঠাকুর অন্ধ পথিকের ন্যায় নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার অনুসরণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে সংসারের দুই একটা ধাক্কা আসিয়া তাঁহাকে পথচ্যুত করিতে চেষ্টা পাইতেছিল বটে, কিন্তু ঠাকুর স্বভাবসিদ্ধ-ধৈর্য্য গুণে তাহাদিগকে উপেক্ষায় দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে নিয়তি-চক্র-রেখাঙ্কিত পথে সমান ভাবে চলিতেছিলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে তিনি জীবনের ত্রিশটী বৎসর অনায়াসে পশ্চাতে ফেলিয়া দিলেন।

ঠাকুরের এরূপ চলিবার পক্ষে যে বিশেষ কোন বাধাবিঘ্ন ছিল তাহা নহে। ক্ষুদ্র কুলাবেড়ে গ্রামখানির উপর একটা আন্তরিক টান, আর সেই গ্রামে ছয় বিঘা পাঁচ কাঠা সাড়ে তিন ছটাক পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর জমি, বাস্তুভিটার উপর দুইখানি ছোট ছোট খড়ো ঘর, ঘরের পশ্চাতে একটা পুরাতন বড় তেঁতুল গাছ এইগুলি ব্যতীত তাঁহার আর কোন সাংসারিক বন্ধন ছিল না। তবে তিনি ইচ্ছাতেই হউক বা অনিচ্ছাতেই হউক সংসারের আরও কতকগুলা বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। বোধ হয় সেই বন্ধনগুলার প্রভাবেই ঠাকুর জীবনের অলস দিনগুলাকে এক প্রকার সুখস্বচ্ছন্দে কাটাইয়া আসিতেছিলেন।

পতি-পুত্র-বিহীনা বৃদ্ধা কামারখুড়ীকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও না দেখিয়া আসিলে ঠাকুরের চলে না। সদয় পাল, বড় গরীব, সব দিন আহার জোটে না, তাঁহার খোঁজ তো লইতেই হইবে। শবদাহ স্থলে তাঁহার উপস্থিতি তো চাই-ই। রাম চক্রবর্ত্তীর ছেলের কঠিন পীড়া; রাত্রি-কালে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে কে একক্রোশ দূরে ডাক্তার ডাকিতে যাইবে? ছেলেটা বেঘোরে মারা যায়; কাজেই ঠাকুরকে ভিজিতে ভিজিতে অন্ধকার রাত্রিতে মেঠো-পথ ভাঙিয়া ডাক্তারের বাড়ী ছুটিতে হইল। ঘোষালদের

বাড়ীতে দুর্গোৎসব, অনেক লোক খাইবে, কিন্তু ভাত রাঁধিবার লোকাভাব; অগত্যা ঠাকুর মাথায় গামছা জড়াইয়া রৌদ্র ও অগ্নির সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সমস্ত গ্রামখানার মধ্যে যে অংশে যে কাজে লোকাভাব, অনাহুত হইয়াও ঠাকুর সেইখানে গিয়া সে অভাব পূরণ করিতেন। শেষে এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে, ঠাকুর না থাকিলে সেই কুলবেড়ে গ্রামখানার যেন একদিনও চলিত না, আর সেই গ্রামখানা না থাকিলে ঠাকুরেরও যেন একটা দিনও কাটিত না।

ঠাকুরের এখনও বিবাহ হয় নাই। তিনি শ্রোত্রিয়; পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। চেষ্টা করিলে যে এতদিন পণের টাকার যোগাড় না হইত এমন নহে, কিন্তু ঠাকুর কোন দিন সে চেষ্টা করেন নাই। কেন করেন নাই তাহা তিনিই জানেন। বোধ হয় নিজের উপর বা সংসারের উপর ঔদাসীন্যই ইহার কারণ।

(২)

সুখেই বল আর দুঃখেই বল, দিনগুলা যদি চিরকাল একই ভাবে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় সংসার-যন্ত্রটা এতদিন অচল হইয়া পড়িত। চিরকাল যেমন একটা সুর ভাল লাগে না, সংসারটাও তেমনই চিরদিন একই ভাবে

একই রকমে ভাল লাগিতে পারে না, মাঝে মাঝে তাহার গতির পরিবর্ত্তন চাই। এই পরিবর্ত্তনের জন্যই তাহাতে এত বৈচিত্র্য এত মমতা, এত আশা এত ভরসা। ঠাকুরের অদৃষ্ট-চক্রটাও এই নিয়মের বশে এত দিনের অবলম্বিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আর একটা নূতন পথে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মধ্যে তাঁহার এক শত্রুর আবির্ভাব হইল।

মনে করিও না, যে কখন কাহারও অনিষ্ট করে নাই, সংসারে তাহার শত্রু থাকিতে পারে না। ইহা একটা মস্ত ভুল। ঘটনাচক্র এমনই কুটিল যে, কখন্ তাহার কোন একটি অতিসূক্ষ্ম ছিদ্রাবলম্বনে আর একটি প্রতিকূল ঘটনার উদ্ভব হয়, তুমি তাহার কিছুই টের পাইবে না। অথচ এক সময় হয় তো দেখিবে,সেই অজ্ঞাত অচিন্তিত ঘটনা-সূত্র ধরিয়া একটা বিপদের করাল মূর্ত্তি তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, মহেশ ঠাকুর জীবনে কাহারও কোনও অপকার করেন নাই, বরং প্রাণপণে উপকারই করিয়াছেন,তবে সহসা বৃদ্ধ মদন ঘোষাল তাঁহার প্রবল শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইলেন কেন? তোমরা হয় তো বলিবে, ঘোষাল মহাশয় এই পঞ্চাশ বর্ষ বয়সে তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী লইয়া নূতন সংসার পাতিয়াছেন; মহেশ ঠাকুরেরও তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত আছে; বোধ হয় এই খানেই কোনও

একটা গলদ আছে। কিন্তু আমরা জানি, এরূপ পাপবাসনা কোন দিনই ঠাকুরের হৃদয়ে ছায়াপাতও করিতে পারে নাই। তবে কেন এমন হইল? উত্তর—ঐ কুটিল ঘটনাচক্র। অতএব আইস, আমরা এই ঘটনাচক্রকে নমস্কার করিয়া ঠাকুরের অদৃষ্টের গতিটা পর্য্যবেক্ষণ করি।

ঘোষাল মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের পত্নী অন্নদাসুন্দরীর যৌবনও যেমন, রূপও তেমনই। তবে আক্ষেপের বিষয় তাঁহার এই যৌবন—এমন রূপ এক পককেশ স্খলিতদন্ত বৃদ্ধের হস্তে পড়িয়া মাটী হইতে বসিয়াছে। সংসারে রত্নের আদর নাই। থাকিলে এমনটা হইবে কেন? আর ঐ একজন অবিবাহিত যুবা—ঐ যে হতভাগা মহেশ ঠাকুর, কুসুমশরের আয়াস-সহকারে নিক্ষিপ্ত এত অস্ত্র, নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করিয়া একটুও টলিবে না কেন? যদি সে এ রণে পৃষ্ঠভঙ্গও দিত, তাহা হইলেও কথা ছিল। কিন্তু সে যে যুদ্ধক্ষেত্রে অক্ষত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া তাহার এত কৌশল এত আয়াসকে ব্যর্থ করিবে, ইহা অসহ্য। সুতরাং অন্নদার সমস্ত রাগটা নিরীহ মহেশ ঠাকুরের উপর পড়িল। অন্নদা যখন তাঁহার উপর রাগিল, তখন ঘোষাল মহাশয় আর না রাগিয়া থাকিতে পারিলেন না, আর তাঁহার সঙ্গে সমস্ত সমাজটাই ঠাকুরের উপর খড়্গহস্ত হইল। কারণ ঘোষাল মহাশয়ই সমাজের

মাথা। তখন এক অন্নদার পাপবাসনা পূর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া ঠাকুর একে একে উপেক্ষিতা অন্নদার, ঘোষাল মহাশয়ের এবং সমাজের বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়িলেন। ঘটনা-চক্রের গতিই এইরূপ।

ঠাকুর কিন্তু প্রথম প্রথম এত কথা বুঝিতে পারেন নাই। প্রথম কেন, শেষেও পারেন নাই। না পারিলেও ইহার সম্পূর্ণ ফলটা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

(৩)

সে বৎসর ফাল্গুন মাসের প্রথমেই চারিদিকে বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হইয়াছিল। সে কালব্যাধি একবার যে বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছিল, সে বাড়ী শূন্য হইয়া পড়িতে-ছিল; গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতেছিল। ক্রমে এই ভীষণ ব্যাধি কুলবেড়ে গ্রামে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশের সঙ্গেই গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল। শবদেহে মাঠ ঘাট ভরিল। এই রোগের প্রবল আক্রমণে রামনাথ চক্রবর্ত্তী দুই পুত্র, পত্নী ও জামাতা সহ ইহলোক হইতে অপসৃত হই-লেন। বাড়ীতে রহিল কেবল তাঁহার শোকশীর্ণা বৃদ্ধা মাতা এবং সদ্যোবিধবা ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা শ্যামা। তাহাদিগকে দেখিবার মধ্যে থাকিলেন, উপরে ভগবান্, আর দুনিয়ায় মহেশ ঠাকুর।

বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ঠাকুর সংসারের নিকট যত-গুলা আঘাত পাইয়া আসিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে এই আঘাতটাই তাঁহার নিকট গুরুতর বলিয়া বোধ হইল। পরদুঃখ-কাতর হৃদয় পরের কষ্ট দেখিলেই ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্যামার বৈধব্য-যন্ত্রণাটা তাঁহাকে তদপেক্ষা একটু অধিক ব্যথিত করিল। ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন যে, তাঁহাদের উভয়ের অতীত জীবনে বাল্যক্রীড়ার সহিত বুঝি একটা প্রণয়াত্মক ভালবাসার উদ্ভব হইয়াছিল—শ্যামার না হইলেও অন্ততঃ ঠাকুরের হইয়াছিল। এরূপ অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, ঠাকুর যখন প্রায় যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন শ্যামার জন্ম হইয়াছে; সুতরাং এখানে প্রণয়সঞ্চারের প্রধান হেতু বাল্যক্রীড়াটার সম্পূর্ণ অভাব।

তবে ঠাকুর যে শ্যামাকে ভালবাসিতেন, ইহা নিশ্চয়। সংসারে আসিয়া কবে যে তিনি পিতামাতার স্নেহক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া পিতার পিতৃব্য-পত্নীর হাতে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনেই নাই। তারপর সেই স্নেহ-শালিনী অথচ অপ্রিয়ভাষিণী প্রতিপালিকাও যে কালস্রোতে কবে কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল, তাহাও বেশ স্মরণ হয় না। সুতরাং ঠাকুরের জীবনটা বড় নীরবে নির্জ্জনেই কাটিতেছিল।

কিন্তু প্রতিবাসী রাম খুড়ার মেয়ে শ্যামা যখন হইতে চলিতে শিখিল, তখন হইতেই সে নিয়ত আসিয়া তাঁহার সেই চির-নীরবতা ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল, তাঁহার শুষ্ক অবসন্ন জীবনটাকে সজীব করিয়া তুলিতে লাগিল। সেই ক্ষুদ্র বালিকার আদর ও অভিমানে, আবদার ও তিরস্কারে ঠাকুর যেন জীবনে সেই প্রথম সুখের আস্বাদ—সংসারের মাধুর্য্য অনুভব করিলেন। ক্রমে সেই ক্ষুদ্র বালিকা বড় হইল; এক দুই করিয়া একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। কিন্তু তখনও সে তাহার মহেশদা'র সঙ্গ ছাড়িল না। তাই তাহার ঠাকুরমা পরিহাস করিয়া বলিতেন, "তোর দাদাই বুঝি শেষে তোর বর হবে।" এই পরিহাসটায় ঠাকুরের মনে একটা নূতন ভাব জাগিয়া উঠিত। কিন্তু যে দিন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্যামার পিতা কুলীন, তিনি শ্রোত্রিয়, সুতরাং শ্যামার সহিত তাঁহার বিবাহ অসম্ভব, সেই দিনই তিনি এ আশার মূলচ্ছেদন করিলেন, ইহার দাগটুকু পর্য্যন্ত আর তাঁহার হৃদয়ে রহিল না।

তারপর শ্যামার বিবাহ হইয়া গেল। রাম খুড়া কুলীন জামাতাকে আপনার গৃহে আনিয়া রাখিলেন। শ্যামা তাঁহার সহিত সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিল। ঠাকুরও আপনার অদৃষ্টের পথে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিন

শ্যামা পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়া, কেবল বৃদ্ধা ঠাকুরমার হাত ধরিয়া অসহায় অবস্থায় সংসার-পথে দাঁড়াইল, সেই দিন হইতে ঠাকুর আবার তাহার ভার গ্রহণ করিলেন, সম্ভাবিত সহস্র বিপদের—সহস্র কষ্টের মুখ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু আমি সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া একটী ভাল কাজ করিতে গেলে সকলেই যে তাহাকে ভাল বলিবে, কেহই যে তাহার ভিতর একটুকু ছিদ্র—এতটুকু দুরভিসন্ধি দেখিতে পাইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং ঠাকুরেরও এই সহানুভূতিমূলক কাজটার মধ্যে কেহ কেহ একটী ছিদ্র—একটী অসদুদ্দেশ্য দেখিতে পাইল। যাহারা দেখিল তাহাদের মধ্যে ঘোষাল মহাশয়ই প্রথম ও প্রধান দ্রষ্টা,এবং তাঁহার পত্নী অন্নদাসুন্দরীই ইহার নিরপেক্ষ সমালোচিকা। এই দর্শন ও সমালোচনার ফলে গ্রামের মধ্যে শীঘ্রই শ্যামার নামের সহিত বিজড়িত ঠাকুরের একটী কল্পিত অসদভিসন্ধি ও অপবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে যদু দাঁর মুদীখানার দোকান, বড় পুকুরের ঘাট এবং চৌধুরীদের বৈঠকখানার পাশার আড্ডা হইতে ইহার একটী তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল। পাঁচসাত দিন আন্দোলন চলিল। তারপর একদিন প্রকাশ্য সভায় ঘোষাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে মহেশ ঠাকুর সমাজচ্যুত

হইলেন। তাঁহার সহিত আহার-ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল, ধোপা নাপিত বন্ধ হইল, এবং যদিও তিনি তাম্রকূটভক্ত ছিলেন না, তথাপি তাঁহাকে হুঁকা প্রদানের নিষেধাজ্ঞাও প্রচারিত হইল। তারপর গ্রামখানা আবার শান্ত হইয়া পড়িল। কেবল মেয়ে-মহলে একটু আধটু আন্দোলন চলিতে লাগিল। দুই একটা রমণীসভায় অন্নদাসুন্দরী, 'পোড়ারমুখী' শ্যামাকে শত ধিক্কার প্রদান করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-সূচক দুই চারিটা বক্তৃতাও দিলেন।

(৪)

লোকে বলে 'স্বভাব যায় না ম'লে।' তাই এত নির্য্যাতনের পরও ঠাকুর আপনার দুষ্ট স্বভাবটীকে ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি সকল নির্য্যাতন—সকল অপবাদকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তবে একটা বিষয়ে ঠাকুর একটু আঘাত পাইলেন। এখন আর কেহ তাঁহাকে বিপদে-সম্পদে ডাকে না। তিনি অযাচিত হইয়া সাহায্য করিতে গেলেও কেহ তাহা গ্রহণ করে না। এ আঘাতটী তাঁহার পক্ষে বড় কম নহে। কিন্তু ইহাও তিনি সহ্য করিলেন।

ঠাকুর সহ্য করিলেও শ্যামার কিন্তু এতটা সহিল না। তাহাকে সাহায্য করিয়া একজন নিরীহ নির্দ্দোষী যে সমাজের

এমন গুরুতর শাসনটা ভোগ করিবে ইহা বড়ই কষ্টকর। ইহার তো একটা উপায় করা চাই। তাই একদিন শ্যামা, ঠাকুরকে বলিল,—"এ দেশ ছাড়িয়া গেলে হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন,—"না।"

শ্যামা। কেন?

ঠা। তাহাতে দুর্নাম আরও বাড়িবে। এখনও ইহাতে যাহাদের সন্দেহ আছে, তাহারাও ইহা বিশ্বাস করিবে।

শ্যা। করে করুক, আমরা অনেক দূরদেশে চলিয়া যাইব।

ঠা। যেখানেই যাও এই মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা সঙ্গে যাইবে।

শ্যা। তবে উপায়?

ঠা। উপায় ভগবান।

শ্যামা একটু ভাবিয়া বলিল,—"এক কাজ করিলে হয় না?"

ঠা। কি?

শ্যা। তুমি আর এখানে আসিও না।

ঠা। তোমাদিগকে কে দেখিবে?

শ্যা। ভগবান।

ঠা। না শ্যামা, এ বিষয়টী আমি কেবল ভগবানের

উপর নির্ভর করিতে পারিব না। যদি পারিতাম, তাহা হইলে কখনও তোমাকে এত মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিনী হইতে দিতাম না। তুমি জান না, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার কি বিপদ হইতে পারে।

শ্যামা সে বিপদের কথা বুঝিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমার কি মরণ হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন,—"মরণ একদিন হইবেই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মরণাধিক বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ!"

শ্যামা শিহরিয়া উঠিল। ঠাকুর বলিলেন, "চিন্তা কি শ্যামা,—মানুষের বিচারে কি হব? ভগবানের নিকট বিচারের জন্য প্রস্তুত থাকলেই নিশ্চিন্ত।"

কিন্তু শ্যামা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একে শোকের তীব্র তাড়না, তাহার উপর লোকের তীব্র গঞ্জনা, শ্লেষোক্তি, সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের একমাত্র বন্ধু মহেশদা'র নির্য্যাতন; এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তাহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার উপর নব ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে আহারাদি বিষয়েও অনেক অত্যাচার চলিতে লাগিল। প্রথমে দেহ দুর্ব্বল, তারপর একটু একটু জ্বর হইল, শেষে অত্যাচারে সেই জ্বর ভীষণভাব ধারণ করিল; শ্যামা শয্যাশায়িনী হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল,—"এ অভাগীর কি মরণ নাই ঠাকুর!"

ঠাকুর দেশে কবিরাজের নিকট ঔষধ পাইলেন না, বিদেশ হইতে ঔষধ আনিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে শয়নের জন্য যাহার প্রাণ ব্যাকুল, সে কি ঔষধ খায়? সুতরাং কবিরাজের বটিকাগুলি শয্যার নীচেই পড়িয়া রহিল, শ্যামার উদরস্থ হইল না। শেষে একদিন নিদাঘের স্তব্ধ সন্ধ্যায় শ্যামা মৃত্যুর স্নিগ্ধ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সংসারের সকল যন্ত্রণা—সকল অপবাদ হইতে চির-মুক্তি লাভ করিল।

(৫)

ধিকি ধিকি চিতা জ্বলিতেছে। উষার প্রথম রশ্মি আসিয়া তাহা স্পর্শ করিতেছে। ঠাকুরের অবশিষ্ট সংসার-বন্ধন—অদৃষ্টের শেষ সূত্রটাও বুঝি তাহার সঙ্গে পুড়িতেছে। শেষ থাকিতেছে, একটী নীল ধূমরেখা,—তাহাও শেষে অনন্ত নীলাকাশে মিশিয়া যাইতেছে। তাহার পর—শেষ আর নাই।

ফুলবেড়ে গ্রামে বনের পাখীরা যখন প্রথম প্রভাতী সঙ্গীত গাহিল, গৃহস্থেরা যখন "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া শয্যাত্যাগ করিল, তখন চিতা নির্ব্বাপিত হইয়াছে; শ্যামার শেষ চিহ্ন পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আর মহেশ ঠাকুর—গ্রামের লোকেরা খুঁজিল—ঠাকুর কোথায়? ঠাকুর কোথায়?

ঠাকুর নাই। গ্রামখানা যেন একবার রুদ্ধ করুণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"ঠাকুর! ঠাকুর!" কিন্তু ঠাকুর কোথায়?—

ঠাকুর তখন অদৃষ্টের শেষ সূত্রটুকু ছিন্ন করিয়া, অনন্ত শান্তি, অনন্ত তৃপ্তি হৃদয়ে লইয়া অনন্তের পথে ছুটিয়াছে। পশ্চাতে পড়িয়া সংসার ডাকিতেছে,—"ঠাকুর! ঠাকুর!"

———

গঙ্গাস্নান।

—:•:—

(১)

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

অপরাহ্ন কালে শিরোমণি মহাশয় চতুষ্পাঠীর মধ্যে বসিয়া নস্যগর্ভ শম্বুকটীর গাত্রে টোকা দিতে দিতে, জনৈক ছাত্রকে উক্ত গঙ্গামাহাত্ম্যসূচক শ্লোকটীর অর্থ বুঝাইয়া দিতেছিলেন, আর এক পার্শ্বে ভিন্নাসনে বসিয়া বৃদ্ধ হলধর ঘোষ মুদ্রিত নয়নে হরিনামের মালাটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক মনে শিরোমণি মহাশয়ের মুখনিঃসৃত বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যাখ্যা শেষ হইলে হলধর চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"দাদা ঠাকুর! সত্যি কি তাই হয়?"

শিরোমণি মহাশয় একটিপ নস্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নহে।"

হলধর আর কিছু বলিল না। সে কেবল মনে মনে বার বার আবৃত্তি করিয়া শ্লোকটী মুখস্থ করিতে লাগিল।

আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার কালিমাচ্ছন্ন মুখটা যেন এক একবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। তারপর সন্ধ্যা হইলে শিরোমণি মহাশয় সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন; হলধর তাঁহাকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে আপনার গৃহাভিমুখে চলিল।

তা' হলধর যে চিরদিনই এইরূপ বৃদ্ধ ছিল, এবং হরি-নামের মালা হাতে শিরোমণি মহাশয়ের টোলে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য একপার্শ্বে বসিয়া থাকিত, তাহা নহে। এক-দিন—সে অতি অল্প দিনের কথা—তাহার ভয়ে সনাতনপুর গ্রামখানা তটস্থ হইল। সে তখন নিতাইগঞ্জের জমিদার চৌধুরী বাবুদের বাটীতে নায়েবী করিত; তখন তাহার উন্মাদ যৌবন ছিল, দেহে অসুরের ন্যায় শক্তি ছিল, মস্তিষ্ক কূটবুদ্ধির আকর ছিল; আর তাহার নামের সহিত একটা সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর প্রতাপ বিজড়িত ছিল। সকলেই সভয়ে সম্মানের সহিত তাহার নাম উচ্চারণ করিত। কিন্তু চির-ধ্বংসশীল কালের প্রচণ্ড আঘাতে এখন তাহার সব গিয়াছে; সে যৌবন গিয়াছে, সে শক্তি গিয়াছে, সে সাহস ও বুদ্ধি গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতাপ ও সম্মান অন্তর্হিত হই-য়াছে। এখন আছে কেবল অনন্তকালস্থায়িনী চিন্তা, অতীত স্মৃতিবিজড়িত একটা তীব্র অনুতাপ, কালের একটা

মর্ম্মভেদী কঠোর উপহাস। আশার সমুন্নত সুখ-সৌধ বিচূর্ণ হইয়াছে, তথায় আছে কেবল দীর্ঘশ্বাস-বিজড়িত ভগ্নস্তূপ; জীবনের অবলম্বন সে উৎসাহ-বিহঙ্গম উড়িয়া গিয়াছে, আছে শুধু হতাশপূর্ণ শূন্য পিঞ্জর। কিন্তু কিসে কি হইল, সেই কথাটাই আগে বলিব।

(২)

সনাতনপুরে হলধর ঘোষের ন্যায় বড় লোক আর ছিল না। সে যখন নায়েবী পদ পাইয়া প্রথম চৌধুরী [illegible]দের বাটীতে প্রবেশ করে, তখন তাহার একটী ভগ্নপ্রায় ক্ষুদ্র একতালা বাটী এবং কয়েক বিঘা জমি ব্যতীত আর কিছু ছিল না। কিন্তু নায়েব হইবার অল্পদিন পরেই তাহার সেই ক্ষুদ্র গৃহ, অট্টালিকায় পরিণত হইল, চারিদিক হইতে আত্মীয় স্বজনগণ আসিয়া সে অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিল; দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়া কলাপ চলিতে লাগিল। একটী শিব-মন্দির এবং দুইটী বৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত হইল, দানধ্যানের অবধি রহিল না; দেশ বিদেশ হইতে দায়গ্রস্ত কত লোক আসিয়া তাহার দ্বারস্থ হইতে লাগিল।

সকলেই সবিস্ময়ে হলধর ঘোষের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। জমিদার মহাশয়েরাও ইহা দেখিলেন—বুঝিলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না। কারণ হলধরের দ্বারা

তাঁহারা তখন আশাতীত উপকার পাইতেছিলেন। পূর্ব্বে যে মহালে একটী পয়সাও খাজানা আদায় হইত না, এখন সুকৌশলী হলধর সেখানে গিয়া কড়ায় গণ্ডায় খাজনা আদায় করিতেছে। যেখানে প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, সুচতুর হলধর সেখানে গিয়া আপনার অপ্রতিহত প্রতাপে প্রজাদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দিতেছে। ঘর জ্বালাইয়া গৃহ-লুণ্ঠন করিয়া, কূট মোকদ্দমা চালাইয়া, অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া বিদ্রোহী প্রজাবর্গকে হলধর শাসন করিত। তাহার ভয়ে আর কেহ জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইত না। জমিদার দেখিলেন, হলধরের গুণে জমিদারির আয় ক্রমেই বাড়িতেছে, পতিত মহাল উদ্ধার পাইতেছে। এ অবস্থায় তাহাকে কিছু বলা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বিশেষতঃ, প্রভূত আয় দেখাইয়া মাঝে হইতে সে যদি কিছু লাভ করিতে পারে, তাহাতে এমন ক্ষতিই বা কি? সুতরাং হলধরের উন্নতি-স্রোতটা কিছু দ্রুতগতিতে চলিল।

একমাত্র নায়েবীই হলধরের উন্নতির মূল ইহা সকলে জানিলেও, আমরা কিন্তু জানি, ইহা ছাড়া তাহার আর একটা লাভজনক কারবার ছিল। তখন দেশে ডাকাতির বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। সে প্রদেশে যেখানে যত ডাকাতি হইত,

সে সকলের মধ্যেই জলধরের যোগ থাকিত। সে নিজে কোথাও ডাকাতি করিতে যাইত না, কিন্তু যেখানে যত ডাকাতি হইত, তাহার সমস্ত অর্থই তাহার হাতে আসিয়া পড়িত। তাহাকে না জানাইয়া কেহ কোন স্থানে ডাকাতি করিতে সাহসী হইত না; করিলেই ধরা পড়িত। তৎকালে অনেক বড় লোকই এই কার্য্যের সহিত সংলিপ্ত থাকিতেন, এবং এই উপায়ে অনায়াসে আপনাদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া লইতেন।

এই ধনীদিগের সহায়তা না পাইলে ডাকাইতগণেরও ব্যবসায়ে সুবিধা হইত না। তাহারা ডাকাতি করিত, কিন্তু অপহৃত ধন গোপন করিবার স্থান পাইত না। তাহারা নিজে সেই সকল চোরাই মাল বিক্রয় করিতে গেলে প্রায়ই ধরা পড়িত। কিন্তু বড়লোকের সহিত যোগ থাকায় তাহারা সেই সকল বহুমূল্য দ্রব্য আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিত, ধনী আপন ইচ্ছামত মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া লইতেন। ডাকাইতেরা যাহা পাইত, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইত। ইহাতে তাহাদের আরও একটা বিশেষ উপকার হইত,—সন্দেহ বশতঃ পুলীস আসিয়া তাহাদের ঘর খানাতল্লাসী করিলেও চোরাই মালের সন্ধান পাইত না। অধিক পীড়নে কোনও অশিক্ষিত ডাকাইত ধনীর নাম বলিয়া ফেলিলেও, পুলীস

তথায় খানাতল্লাসী করিতে সাহসী হইত না, বা ইচ্ছা করিয়াই তাহা করিত না। কেন করিত না, তাহা অপ্রকাশ্য। কিন্তু এই ধনীর নামও দলপতি ভিন্ন দলের আর কেহই প্রায় জানিতে পাইত না। সুতরাং ধনীরাও নিঃশঙ্কচিত্তে এই ব্যবসায় চালাইতেন। এইরূপ দস্যুতা-লব্ধ ধনে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের অনেক বংশধর এখনও অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছেন; এবং ভদ্রসমাজে আপনাদিগকে বনিয়াদি বড়লোক বলিয়া সগর্ব্বে পরিচয় দিতেছেন।

এইরূপ উপায়ে হলধর শীঘ্রই অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া উঠিল, চারিদিকে তাহার নাম জাহির হইয়া পড়িল। তা' ছাড়া আপনার অধীনস্থ এলাকার মধ্যে যেখানে যত নিঃস্ব ব্রাহ্মণের দলিলহীন ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর প্রভৃতি জমি ছিল, হলধর তৎসমস্তই আপনার সম্পত্তিভুক্ত করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে দান-ধ্যান, ক্রিয়া-কলাপের মাত্রাও বাড়িতে লাগিল। ইহাতে তাহার সমস্ত দোষই চাপা পড়িয়া গেল, চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিল। কেবল স্পষ্টভাষী গোপাল সরকার একদিন বলিয়া ফেলিয়াছিল, "গরু মেরে জুতো দান।" এজন্য সরকার মহাশয়কে হলধরের হস্তে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু এত ঐশ্বর্য্য, এত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াও হলধরের মনে প্রকৃত শান্তি ছিল না। সে যখনই নিভৃতে আপনার হৃদয় পানে চাহিত, তখনই কাঁপিয়া উঠিত। তাই সে বাহ্য সৎকর্ম্মের আবরণ দ্বারা আপনার হৃদয়ের দুষ্কৃত-ভার চাপিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

(৩)

সহস্র চেষ্টাতেও পাপ কখনও প্রচ্ছন্ন থাকে না। যদি থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাস নিশ্চয়ই অন্যরূপ আকার ধারণ করিত। বিশ্ব নিয়ন্তার এমনই অলঙ্ঘনীয় স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও পাপ কিছুতেই চিরদিন গুপ্ত থাকে না। একদিন না একদিন তাহার দুর্ভেদ্য অন্ধকার-রাশি ভেদ করিয়া পুণ্যের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিভাসিত হইবেই হইবে; একদিন নিশ্চয়ই ধর্ম্মের উন্নত আসনের নিকট অধর্ম্ম স্বীয় মস্তক অবনত করিবে, সত্যের অলৌকিক বিক্রমে মিথ্যার কল্পিত আবরণ একদিন বিদূরিত হইবেই হইবে। প্রকৃতির ইহাই মহিমা, বিশ্ব-চক্রের ইহাই স্বাভাবিক গতি।

বহু দুষ্কর্ম্ম করিয়াও হলধর যে রাজ-পুরুষগণের দৃষ্টিতে ধূলি-নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিল, তাহার মূল কারণ, দেবী-পুরের থানার দারোগা বাবু। তাঁহারই কৌশলে এবং

কল্পণায় কেহই তাহার কিছু করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠিল, পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিল, হলধর তখন দারোগা বাবুর কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইল। তাহার বহু জলসিঞ্চনে বৰ্দ্ধিত বিষবৃক্ষ মুকুলিত হইয়া উঠিল।

একবার একটা নদীগর্ভোত্থিত চড়া লইয়া নূতনবাড়ী গ্রামের জমিদার খাঁ বাবুদের সহিত চৌধুরী বাবুদের বিবাদ বাধিল। বিরোধ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই ক্ষুদ্র স্থানটুকু অধিকার করিবার জন্ত উভয় পক্ষই সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। জেদটা হলধরেরই কিছু বেশী। কারণ, বিপক্ষ পক্ষের নায়েব মহাশয় বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, এ আর বড় লোকের সিন্দুকের টাকা নয় যে, এক অন্ধকার রাত্রেই হলধর ঘোষের বাক্সে আসিয়া পড়িবে। কথাটা হলধরের মর্ম্মে বিঁধিয়াছিল।

ক্রমে উভয় পক্ষই স্থানটা দখল করিবার জন্য লোকজন সহ প্রস্তুত হইল। সকলেই বুঝিল, একটা ভীষণ দাঙ্গা বাধিবে। দাঙ্গার পূর্ব্ব দিবস রাত্রিকালে হলধর স্বয়ং থানায় গমন করিয়া শান্তিরক্ষার্থ উপস্থিত হইবার জন্য দারোগা বাবুর হস্তে তিন শত টাকার খুচরা নোট গুঁজিয়া দিয়া আসিল। সে বুঝিয়াছিল, বিপক্ষপক্ষের লোকবল অধিক;

সুতরাং দারোগা বাবুর সহায়তা ব্যতীত এক্ষেত্রে জয়লাভ অসম্ভব। কিন্তু সে চলিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পরেই বিপক্ষ-দলের নায়েব মহাশয় যে সহাস্য বদনে দারোগা বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা হলধর দেখে নাই।

পরদিন সেই চড়ার নিকট উভয় পক্ষই সমবেত হইল। তারপর লাঠী সড়্‌কী চালাইয়া উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দারোগা বাবু দলবল সহ দূরে দাঁড়াইয়া এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। দাঙ্গায় বিস্তর লোক হতাহত হইবার পর, শেষে বিপক্ষ পক্ষই জয়লাভ করিল। হলধর দেখিল, শেষ পর্য্যন্ত দারোগা বাবু সেই একস্থানে সমান ভাবে দণ্ডায়মান। সে বুঝিল, দারোগা বাবু সিন্নি খাইয়া ভরা ডুবাইলেন। তাহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। এ পরাজয়ের সমস্ত অপমানটা আসিয়া যেন তাহারই ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিল, তাহারই মাথাটা যেন ঐ চড়াভূমির বালুকার উপর বিপক্ষের পদতলে লুণ্ঠিত হইল। তাহার সমস্ত রাগটা দারোগা বাবুর উপর পড়িল।

হলধর রাগের মাথায় মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে জানাইল যে, দারোগা বাবু পূর্ব্বে দাঙ্গার সংবাদ পাইয়াও শান্তিরক্ষায় মনোযোগী হন নাই, বরং বিপক্ষ পক্ষের নিকট ঘুষ খাইয়া শান্তিভঙ্গের সহায়তা করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব দারোগা

বাবুর কৈফিয়ত তলব করিলেন। দারোগা বাবুও পাকা লোক, তিনি ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল এই দারোগাগিরি করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছেন। কিন্তু এবারে তাঁহাকে একটু বেশী বেগ পাইতে হইল, অনেক কৌশলে তিনি এবার চাকরিটী বজায় রাখিলেন। তারপর তিনি হলধরকে শিক্ষা দিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

(৪)

দারোগা বাবুকে সুযোগের জন্য অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না—শীঘ্রই সুযোগ মিলিল। অল্পদিন পরেই নূতন বাড়ীর দাঁ বাবুদের বাটীতে একটা ভয়ঙ্কর ডাকাতি হইয়া গেল; ডাকাতিতে দুই তিনটা খুনও হইল। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র দারোগা বাবু ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং সত্বর তথাকার তদন্ত শেষ করিয়া হলধরের বাটীতে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়াই বাটী ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। হলধর বাটীতেই ছিল; সে প্রথমে অনেক আপত্তি, অনেক তর্ক করিল, কিন্তু দারোগা বাবু তাহার কোন কথাই শুনিলেন না। তাহাকে নজরবন্দী করিয়া তাহার বাটী খানাতল্লাসী করা হইল।

খানাতল্লাসীতে অপহৃত সকল দ্রব্যই বাহির হইয়া পড়িল। বেগতিক দেখিয়া হলধর, দারোগা বাবুর শরণ

গ্রহণ করিল ; তাঁহাকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইল। কিন্তু দারোগা বাবু কিছুতেই ভুলিলেন না। তিনি বামাল সহ হলধরকে চালান দিলেন। ডাকাতদলেরও অনেকে ধরা পড়িল।

যথাসময়ে দায়রার বিচারে হলধর সঙ্গিগণ সহ শ্রীঘরে চলিল। তাহার পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল।

(৫)

পাপের পতনাবস্থা যেমন ভয়ানক, তেমনই দ্রুতগামী। একবার পতন আরম্ভ হইলে আর রক্ষা নাই ; তখন চারিদিক হইতে সহস্র বিপদ বিকট মুখব্যাদান করিয়া পাপীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয় এবং অচিরেই সুখকাকলী-পূর্ণ পাপ-নগরী শ্মশানের হাহাকারে পূর্ণ করে ; একদিনে—এক মুহূর্ত্তে আশার নন্দন-কাননে মরুভূমির ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেয়।

পাঁচ বৎসর পরে কারামুক্ত হইয়া হলধর যখন ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, তাহার পরিজনপূর্ণ তত বড় বাড়ীটা শূন্য হইয়াছে ; এত দিনের এত চেষ্টায় সে সুখ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন যে একটী সংসার গড়িয়াছিল, ক্ষুদ্র পাঁচটী বৎসরের মধ্যে নিয়তির নির্ম্মম আঘাতে তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ;

কেবল একটা তীব্র বিষাদের হাহাকার বক্ষে লইয়া বাড়ীখানা জনশূন্য শ্মশানের মত নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কার্য্যক্ষম পুত্রদ্বয়, তাহার হৃদয়ে চিরস্থায়ী শেল বিদ্ধ করিয়া এক এক বৎসরের ব্যবধানে পরলোক যাত্রা করিয়াছে; পত্নীও শোকের অসহ যন্ত্রণা বুকে লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে; জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ উন্মাদিনী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনগণও স্ব স্ব আশ্রয়ানুসন্ধানে প্রস্থান করিয়াছে। দাস-দাসীগণ চলিয়া গিয়াছে, গোশালা শূন্য হইয়াছে, পূজার দালানে চামচিকা বাসা বাঁধিয়াছে, অট্টালিকার চূণ সুরকী খসিয়াছে, বাড়ীর মধ্যে চারিদিকে আগাছার বন জন্মিয়াছে। কোন অভিশপ্ত প্রেতের দীর্ঘশ্বাসের মত এক একটা বায়ু-প্রবাহ আসিয়া ধূলি-ধূসরিত রুদ্ধ-দ্বার গবাক্ষে আঘাত করিতেছে। এখন সেই জনশূন্য বৃহৎ বাটীর মধ্যে কেবল বিধবা কনিষ্ঠা পুত্রবধূ ক্ষীণ সন্ধ্যা-দীপ জ্বালাইবার জন্য একা একপার্শ্বে পড়িয়া আছে।

স্তম্ভিত হৃদয়ে হলধর এই ভীষণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। অবশেষে সে বুঝিল, ইহা তাহারই স্বহস্তরোপিত বিষবৃক্ষের প্রথম ফল মাত্র।

(৬)

শত শত উপদেশে সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তে যে ফল না হয়, কালের একটী মাত্র আঘাতে তদপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। যুগব্যাপী প্রাণান্ত চেষ্টায় যে হৃদয় দমিত হয় না, কালের একটী আবর্ত্তনে এক মুহূর্ত্তে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই আঘাতের ফলেই দস্যু রত্নাকর লম্পট বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি একদিনে মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। কালের এই কঠোর আঘাত সময় বা অবস্থাবিশেষে বড়ই হিতকর।

হলধরও কালের এই নির্ম্মম আঘাতে বড়ই শুভফল পাইল। সে, দুরাশায় যে প্রবল পিপাসা হৃদয়ে জাগাইয়া এতদিন অনায়াসে সমস্ত দুষ্কার্য্য সাধন করিয়া আসিতেছিল, পত্নী-পুত্রের মৃত্যুর সহিত তাহার সে সর্ব্বনাশিনী তৃষ্ণার অবসান হইল। তৃষ্ণানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পরলোকের ভীষণ চিত্র, নরকের দুর্দ্দশ্য আলেখ্য তাহার সম্মুখে নাচিয়া উঠিল; একদিন তাহাকেও যে পত্নী-পুত্রের ন্যায় এই মহা-পথের পথিক হইয়া মহাবিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল; সেই মহাবিচারের দিন স্মরণ করিতেও সে ভীত হইল। তখন দুষ্কর্ম্মে ঘৃণা আসিল, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল, হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; সে বহ্নির দহনে হলধর অস্থির হইয়া পড়িল।

হলধর এখন আর কাহারও সহিত কথা কহে না, কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠে; অতীতের কঠোর স্মৃতি আসিয়া হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে। সে আঘাতে কাতর হইয়া হলধর ভাবে, হায়, জীবন দিলেও কি অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না? এখন সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই হলধর তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট প্রায়শ্চিত্তের বিধান জিজ্ঞাসা করে।

একদিন জনৈক বৃদ্ধ বাবাজি তাহাকে বলিলেন,—"হরিনাম কর, হরিনামে সকল পাপ দূর হয়।" সেই দিন হইতে হলধর হরিনাম করিতে লাগিল। সে পূর্ব্বেও হরি-নাম করিত; কিন্তু সেই হরিনামে আর এই হরিনামে কত প্রভেদ! সে হরিনাম ভক্তিশূন্য—প্রাণহীন, কেবল দুষ্কর্ম্মের আবরণস্বরূপ ছিল, কিন্তু এখনকার ভক্তিপূর্ণ প্রাণঢালা এই হরিনাম কত মধুর! হলধর বুঝিল, দুঃখে না পড়িলে বুঝি প্রাণ দিয়া হরিনাম করা যায় না; আর প্রাণ ঢালিয়া হরি-নাম না করিলে তাহার মধুরতা অনুভূত হয় না। হলধর হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি ঢালিয়া হরিনাম করিতে লাগিল।

স্রোতের যখন যে দিকে গতি, সেই দিকেই তাহার অধিক আকর্ষণ। হলধরের প্রবৃত্তি যখন পাপের পথে

ধাবিত হইয়াছিল, তখন সে সেই দিকেই উত্তরোত্তর সুখের আশায়—তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার প্রবৃত্তি ভিন্নমুখী হইয়াছে; ভক্তির কণামাত্র আস্বাদন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, সুতরাং এখন সে তাহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে বুঝিল, হৃদয়ে অতীতের যে আবিলতা রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ধৌত না হইলে তৃপ্তিলাভ অসম্ভব। আবিলতা-পূর্ণ হৃদয় লইয়া হলধর আপনাকে বড়ই অশুচি জ্ঞান করিতে লাগিল। হরিনামে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের মলিনতা তো ধৌত হইল না। কোন্ স্বর্গের পবিত্র সলিল স্পর্শে এই মলিনতা বিধৌত হইবে, তাহারই অন্বেষণে সে ব্যস্ত হইল। তারপর সে যে দিন শিরোমণি মহাশয়ের মুখে গঙ্গার অপরিসীম মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিল, সে দিন যেন তাহার হৃদয়ের ভারটা কিছু লঘু হইল। মনে মনে ভাবিল, তবে আর ভয় কি?

সর্ব্ব-কলুষ-নাশিনী ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে আপনার হৃদয়স্থিত পাপরাশি বিধৌত করিবার জন্য হলধর প্রস্তুত হইল। সম্মুখে মাঘী পূর্ণিমার যোগ। বিধবা পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া হলধর গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিল। পাড়ার আরও কয়েকজন লোক সঙ্গী হইল।

(৭)

তখনও সে প্রদেশে রেল হয় নাই; সুতরাং পদব্রজে পঁচিশ ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া মাঘী পূর্ণিমার দুই দিন পূর্ব্বে সকালে কলিকাতায় উপস্থিত হইল। সম্মুখে কলনাদিনী ভাগীরথীর সুপবিত্র মধুরাহ্বান শুনিয়া হলধরের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হাটখোলার মধ্যে গ্রামের নিতাই দাসের একটী ক্ষুদ্র দোকান ছিল। নিতাইয়ের সহিত হলধরের খাতক-মহাজন সম্বন্ধ ছিল। হলধর লোকজনের সহিত তাহার দোকানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দূর পথ অতিক্রম করিয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়াছিল। বৃদ্ধ হলধরের জীর্ণ ভগ্ন দেহ সর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া উত্তমরূপে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। রাত্রিকালে তাহার যেন একটু জ্বর হইল। কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পরদিন প্রাতে উঠিয়াই সে এক ঘণ্টা ধরিয়া গঙ্গাস্নান করিল। আহারাদির পর জ্বরটা একটু জোরে আসিল। সকলেই চিন্তিত হইল, কিন্তু হলধর তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় জ্বরত্যাগ হইলে সে আবার উত্তমরূপে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। রাত্রি কালে জ্বরের প্রকোপ আরও বাড়িল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে হলধর গঙ্গাস্নানে চলিল। সকলেই তাহাকে স্নান করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু সে হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই, মা গঙ্গার কোলে দেহ রাখিব, এত পুণ্য আমার নাই।"

কিন্তু স্নানের পর হলধর সেই যে শয্যা গ্রহণ করিল, আর উঠিতে পারিল না। জ্বরের প্রকোপে তাহার চৈতন্য রহিত হইল। অপরাহ্নে সকলে দেখিল, জ্বর বিকারে পরিণত হইয়াছে। নিতাই দাস ভীত হইয়া একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী দেখিলেন, হৃৎ যন্ত্রের গতি পরীক্ষা করিলেন; তারপর মুখ বিকৃত করিয়া কয়েকটা ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন; বলিয়া গেলেন, "আশা নাই, আজি রাত্রিটা কাটিলে, কালি সকালে আমাকে সংবাদ দিও।"

হলধরের চৈতন্য নাই, বিকারের ঘোরে আচ্ছন্ন-প্রায়। মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতেছে; প্রলাপের মাঝে মাঝে বলিতেছে,—

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।"

পুত্রবধূ সমস্ত রাত্রি তাহার মাথার শিয়রে বসিয়া রাত্রি কাটাইল।

নিতাই বড় বিপদেই পড়িল। লোককে আশ্রয় দিয়া যে শেষে এমন বিপদে পড়িতে হয় তাহা কে জানে। সে এখন এই পাপ বিদায় করিতে পারিলে বাঁচে। নিতাই, বৃদ্ধের অনেক গুলি টাকা ধারিত।

প্রাতঃকালে নিতাই সকলের নিকট রোগীর গঙ্গাযাত্রার প্রস্তাব করিল। হলধরের পুত্রবধূ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু সকলেই নিতাইয়ের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। নিতাই তখন হলধরের গঙ্গাযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই খাট আসিল। সকলে হলধরকে খাটে তুলিয়া লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। হলধরের তখন বিকারের ঘোরটা কাটিয়াছে, অল্প অল্প চৈতন্য হইতেছে। সে ক্ষীণ-স্বরে জিজ্ঞাসিল,—"আমাকে কোথায় লইয়া যাও?"

নিতাই নিকটে আসিয়া বলিল,—"গঙ্গাতীরে।"

হলধর বলিল,—"মাঘীপূর্ণিমা কবে?"

নিতাই বলিল,—"আজ।"

সকলেই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া হলধরকে খাট হইতে নামাইল। তাহার চরণ হইতে নাভি পর্য্যন্ত অর্দ্ধাঙ্গ গঙ্গার জলে স্থাপন করিল, অপর অর্দ্ধাঙ্গ স্থলে রহিল। পুত্রবধূ, শশুরের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল। সকলে গঙ্গামৃত্তিকা আনিয়া হলধরের সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম লিখিয়া দিল।

গঙ্গাতীরে লোকারণ্য। বহু দূরদেশ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী পূর্ণিমার যোগে স্নান করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই হলধরের মৃত্যু দেখিবার জন্য তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। হলধরের সঙ্গিগণ তাহাকে হরিনাম শুনাইতে লাগিল, সমবেত নরনারীগণও উচ্চকণ্ঠে চারিদিক হইতে হরিধ্বনির উচ্চরোল তুলিল।

হলধর একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল; দেখিল, কি পবিত্র সঙ্গম! কি সুখের মৃত্যু! ঊর্দ্ধে আবরণশূন্য অনন্ত আকাশ, সম্মুখে ত্রিলোকপাবনী জাহ্নবীর অনন্ত সলিলরাশি, চতুর্দ্দিকে অনন্তকণ্ঠে সুমধুর হরিনাম। হলধর মৃত্যুযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া মনে মনে বলিল,—"মাগো পাপনাশিনি জাহ্নবি! এই পুণ্য মুহূর্ত্তে—এই পবিত্র সঙ্গমে তোমার কোলে শুইয়া মধুর হরিনাম শুনিতে শুনিতে মরিলেও কি আমার পাপরাশি বিধৌত হইবে না মা?"

তাহার নেত্র-প্রান্ত হইতে প্রেমাশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল, নাভিশ্বাস উপস্থিত হইল, ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত চক্ষুতারকা স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। একজন তাহার কাণের নিকট মুখ রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, —"বল গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।"

অন্যের অশ্রাব্য স্বরে হলধর তখন বলিতেছে,—

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

উচ্চারণ শেষ করিয়া হলধর ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল, একটা তরঙ্গ আসিয়া তাহার মস্তক পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিল। অনন্তগামিনী পতিতপাবনী জাহ্নবীর বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে পূর্ণিমার পুণ্যময় মুহূর্ত্তে হলধর অনন্তের পথে যাত্রা করিল।

চিরদুষ্কৃতিশালী হলধরের অনুতপ্ত আত্মা মাতৃ-ক্রোড়ে স্থান পাইবে না কি?

কৃতজ্ঞতা।

——:•:——

ক্রোশত্রয়ব্যাপী বিস্তৃত মাঠের মধ্যস্থলে বাবলা গাছে ঘেরা ছোট গ্রামখানি ; গ্রামের নাম তেঁতুল বেড়ে। দশঘর কৈবর্ত্ত, একঘর কুমোর, তিনঘর চাঁড়াল, এবং দুইঘর জেলে মাত্র গ্রামের অধিবাসী। অধিবাসীরা দরিদ্র, চাষই তাহাদের উপজীবিকা। চারিদিকে জনশূন্য বিশাল প্রান্তর, মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র অরণ্যানী সদৃশ এই তেঁতুল বেড়ে গ্রাম। দূর হইতে দেখিলে গ্রামখানিকে একটী ক্ষুদ্র জঙ্গল বলিয়াই বোধ হয়।

গ্রামের প্রান্তভাগে মাঠের ধারে রামধন কৈবর্ত্তের বাস। রামধনের বয়স ষাট বৎসরের উপর। পূর্ব্বে তাহার অবস্থা একটু সচ্ছল ছিল, কিন্তু উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অজন্মা হওয়ায় অবস্থাটা মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর গত বৎসর চৈত্রমাসে চড়কের দিনে—যখন বিবিধবর্ণের পক্ষশোভিত ঢাকের তুমুল শব্দের সহিত গ্রামখানার মধ্যে একটা উৎসবের কল্লোল ছড়াইয়া পড়িতেছিল তখন—তাহার একমাত্র পুত্র

শ্রীমন্ত কঠিন জ্বররোগে পিতাকে কাঁদাইয়া, যুবতী ভার্য্যাকে ফেলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। নিদারুণ পুত্রশোকে রামধনের হৃদয়টা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পত্নীতো বহুপূর্ব্বেই শ্রীমন্তকে দুই বৎসরের রাখিয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তো রামধন ততদূর কাতর হয় নাই? সে কেবল শ্রীমন্তের মুখ চাহিয়া তাহা সহ্য করিয়াছিল, হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও শক্তি ঢালিয়া দিয়া শ্রীমন্তকে বড় করিয়াছিল তাহার বিবাহ দিয়াছিল, শূন্য গৃহে আবার সুখের সংসার পাতিয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তো সে তাহা রাখিতে পারিল না; কালের কঠোর করস্পর্শে বৃদ্ধের একমাত্র হৃদয়বন্ধু, সংসারে আশা ভরসার স্থল পঁচিশ বৎসরের শ্রীমন্ত সেই নূতন পাতান সংসারটাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল? বৃদ্ধের সমস্ত আশা, ভরসা, উদ্যম ভাঙ্গিয়া পড়িল, এত কষ্টের সাজান সংসারটা আবার যে শূন্য সেই শূন্য হইল। সেই শূন্য সংসারে রহিল কেবল শোকজীর্ণ বৃদ্ধ রামধন, আর তাহার সপ্তদশবর্ষীয়া পুত্রবধূ কেতকী।

কেতকী না থাকিলে বুঝি বৃদ্ধ রামধনের হৃদয়ে এত বড় আঘাতটা সহিত না। কেবল কেতকীর যত্নে, কেতকীর ভক্তিতে, কেতকীর সেবায়, কেতকীর মায়ায় বৃদ্ধকে হৃদয়ের জলন্ত আগুনটাও চাপিতে হইল, কেতকীর জন্যই সংসারশূন্য

হইয়াও আবার তাহাকে সংসারী হইতে হইল। আবার শোকজীর্ণ রামধন তরকারীর মোট মাথায় লইয়া চকদিঘীর হাটে চলিল, আবার সে বৈশাখের রৌদ্র, শ্রাবণের ধারাপাত উপেক্ষা করিয়া চাষে খাটিতে লাগিল; কেতকীর মুখে 'বাবা' সম্বোধন শুনিয়া বৃদ্ধ এই মরণের পথে দাঁড়াইয়াও জীর্ণ সংসারটাকে আবার সবলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

রামধনের কয়েক বিঘা তরকারীর ক্ষেত ছিল। তাহাতে বেগুন, শশা, শাক,কুমড়া প্রভৃতি সময়োপযোগী ফসল হইত। হাটের পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে কেতকী বিক্রয়ের উপযুক্ত জিনিস ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া ঠিক করিয়া রাখিত, রামধন সকালে উঠিয়া সেই মোট মাথায় তিনক্রোশ দূরে চকদিঘীর হাটে যাইত। হাট হইতে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইত। সে দিন আর দিবসের মধ্যে কেতকীর খাওয়া হইত না। সে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া, অপরাহ্ণ কাল হইতে দ্বারদেশে বসিয়া শ্বশুরের আগমন প্রতীক্ষা করিত। তারপর দূর হইতে শ্বশুরকে আসিতে দেখিলেই সে তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাত হইতে ঝাঁকাটা লইত এবং শ্বশুরের অগ্রে অগ্রে গৃহে আসিত। গৃহে আসিলে কেতকী জল আনিয়া শ্বশুরের পা ধোয়াইয়া দিত, তামাক সাজিয়া আনিত। তারপর একটু বিশ্রাম করিয়া রামধন আহারে বসিত, কেতকী সম্মুখে বসিয়া,

মাতা যেমন আগ্রহ ও যত্নের সহিত সন্তানকে খাওয়ায়, তেমনই করিয়া তাহাকে খাওয়াইত। শ্বশুরের আহার শেষ হইলে তাহাকে পান ও তামাক দিয়া কেতকী নিজে আহারে বসিত।

এইরূপে কেতকীর যত্নে ও শুশ্রূষায় বৃদ্ধ রামধন সমস্ত ভুলিয়া যাইত; তাহার ভগ্ন অবসন্ন হৃদয়টা আবার সংসারের সহিত কঠোর যুদ্ধের জন্য সবলে বুক বাঁধিত।

(২)

সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। রামধন হাটে গিয়াছিল, কিন্তু এই দুর্যোগে তখনও ফিরিতে পারে নাই। সন্ধ্যার পর বৃষ্টিটা আরও একটু জোরে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। কেতকী দ্বাররুদ্ধ করিয়া, একা ঘরের ভিতর বসিয়া শ্বশুরের জন্য ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে কত কথাই তাহার মনে হইতেছিল। স্বামীর কথা, সংসারের কথা, শ্বশুরের কষ্টের কথা, একে একে সকলই এক একটী ঘোর দুঃস্বপ্নের মত তাহার মনে পড়িতেছিল। হায়! স্বামী—সেই ভীমের মত স্বামী থাকিলে আজি বৃদ্ধ বয়সে শ্বশুরকে এত কষ্ট করিতে হইবে কেন? ভাবিতে ভাবিতে কেতকীর বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহার ব্যথিত হৃদয় হইতে

একটা আকুল দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া ঝটিকাপ্রবাহে মিশিয়া যাইতেছিল। বাহিরে উন্মাদিনী প্রকৃতির ভৈরব তাণ্ডবে দিগন্ত কম্পিত হইতেছিল।

সহসা বহির্দ্বারে ঘন ঘন আঘাত শব্দ হইল। কেতকী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, শ্বশুরের আগমন-সম্ভাবনায় তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখটা হাসিয়া উঠিল। সে ভিজিতে ভিজিতে গিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল। বাহিরে ঘোর অন্ধকার হইলেও ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছিল। সেই বিদ্যুতালোকে কেতকী দ্বারের সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইল। সেরূপ অদ্ভুত মূর্ত্তি কেতকী জীবনে কখনও দেখে নাই। ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া আসিল।

কেতকী যে মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, তাহা আর কিছুই নহে, জনৈক সাহেবের মূর্ত্তি। কেতকী ইহার পূর্ব্বে আর কখনও সাহেব দেখে নাই। কেবল শুনিয়াছিল রেললাইন প্রস্তুত করিতে গ্রামগঞ্জে কয়েকজন সাহেব আসিয়াছে। আজি সম্মুখে সাহেবের অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া কেতকী তাহাকে মনুষ্য অথবা অন্য কোন প্রকার জীব বলিয়া কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। মানুষ হইলে এমন মানুষ তো সে কখনও দেখে নাই। সাহেব দ্বারমোচন-

কামিণীকে এরূপ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় বলিলেন,—"আমি বড় বিপদে পড়িয়াছে।"

বাঁকা বাঁকা কথা হইলেও কেতকী বুঝিল, ইহা মানুষ। তারপর সে বিদ্যুতালোকে দেখিল, মানুষটার সর্ব্বশরীর বৃষ্টিসিক্ত, কর্দ্দমাক্ত, শীতে কম্পমান। কেতকী বুঝিতে পারিল, যেই হউক্, একটা মানুষ ঝড়বৃষ্টিতে মাঠের মাঝে বিপদে পড়িয়াছে। তখনও সমান বেগে বৃষ্টির সহিত করকাপাত হইতেছিল, ঝড়ও চলিতেছিল। কেতকী দেখিল, আশ্রয় না পাইলে মানুষটা আজি এই ঝড় জলে মারা যাইবে। তখন সে সাহসে নির্ভর করিয়া বলিল,—"এস।"

"Thank you girl" বলিয়া সাহেব অগ্রবর্ত্তিনী কেতকীর পশ্চাদনুসরণ করিলেন। কেতকী আসিয়া গৃহের রোয়াকে দাঁড়াইল, সাহেবও দাঁড়াইলেন। কিন্তু ঝড়ের বেগে সেখানে দাঁড়ান দায় হইল। অগত্যা কেতকী ঘরে প্রবেশ করিয়া সাহেবকেও আসিতে বলিল; সাহেব ঘরে আসিয়া "O God!" বলিয়া হাঁফ ছাড়িলেন। কেতকী ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে কেতকী ভাল করিয়া সাহেবের মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদ দেখিল। গ্রামের কেহ কেহ পূর্ব্বে সাহেব দেখিয়া আসিয়াছিল; তাহাদের

মুখে সে যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছিল, এক্ষণে সম্মুখস্থ মূর্ত্তিকেও তদনুরূপ দেখিল। কেবল তাহার মাথায় টুপীটা ছিল না, তাহা ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। কেতকী চিনিল, এও সাহেব। সে শুনিয়াছিল, সাহেবরা দেবতার জাত, কেহ তাহাদের কাছে যাইতে পারে না; তাহারা আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, মন্ত্রবলে গাড়ী চালায়, জলের উপর বাড়ী ভাসায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষণে সেই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সাহেবকে আপন গৃহে বিপন্ন অতিথিরূপে দেখিয়া কেতকীর একটু ভয়-বিমিশ্রিত কৌতুহল হইল। সে সাহস করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিল—"তুমি কি সাহেব?"

সাহেব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—"Yes, আমি সাহেব আছে; কিন্তু আমাকে বড় শীত হইতেছে।"

কেতকী দুইখান শুষ্ক বস্ত্র দিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। বাধ্য হইয়া সাহেব কোট প্যাণ্টালুন পরিত্যাগপূর্ব্বক একখান কাপড় পরিলেন, অপর খান গায়ে দিলেন। ঘরে একখান জলচৌকী ছিল, কেতকী তাহা লইয়া সাহেবকে বসিতে দিল। সাহেব হৃষ্টান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিয়া তাহাতেই উপবেশন করিলেন।

তেঁতুলবেড়ের তিন ক্রোশ পশ্চিমে রেল লাইন নির্ম্মিত

হইতেছিল। তাহারই তত্ত্বাবধারণ জন্য কয়েকজন সাহেব আসিয়া শ্যামগঞ্জে ছাউনি করিয়াছিলেন। আগন্তুক সাহেব তাঁহাদেরই অন্যতম। সাহেবের নাম জন হ্যারিংটন। ছাউনীতে যে কয়জন সাহেব ছিলেন, হ্যারিংটনই তাঁহাদের মধ্যে উচ্চপদস্থ প্রধান কর্ম্মচারী। অদ্য কোনও বিশেষ কার্য্যানুরোধে সাহেব পদব্রজে চকদিঘীর বাজারে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিতে অপরাহ্ন হইয়াছিল। মাঠের উপর দিয়াই রাস্তা। সাহেব যখন সেই বিস্তৃত মাঠের মধ্যস্থলে আসিলেন, তখন সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও বৃষ্টি আসিল। সাহেব ভিজিতে ভিজিতে আশ্রয়ানুসন্ধানে ছুটিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘের অন্ধকারের সহিত মিশিয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিল। হ্যারিংটন অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়া তেঁতুলবেড়ে গ্রামে উপস্থিত হইলেন, এবং বিদ্যুতালোকে সম্মুখেই একখানি বাটী দেখিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য দ্বারে করাঘাত করিলেন। সেই করাঘাতেই কেতকীর চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

(৩)

রজনীর গভীরতা বৃদ্ধির সহিত বৃষ্টির বেগও বাড়িতে লাগিল। কেতকী বসিয়া বসিয়া শ্বশুরের বিষয় ভাবিতে

লাগিল, আর সাহেবও মুদ্রিত নয়নে বসিয়া ছাউ'নস্থ আরাম কেদারার সহিত এই ক্ষুদ্র চৌকীখানির তুলনা করিতে করিতে কে অধিক মূল্যবান্ তাহারই মীমাংসা করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে এই দয়াবতী রমণীর করুণা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতে থাকিলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। তখন কেতকী উঠিয়া জিজ্ঞাসিল,—"সাহেব! তুমি কি খাবে?"

সাহেব উত্তর দিলেন,—"আমি খাইব না।"

কেতকী বলিল,—"তাও কি হয়? অতিথকে উপোস রাখ্‌তে নাই যে সাহেব?"

সে স্নেহকোমল স্বর শুনিয়া সাহেব বিস্মিত হইলেন। একজন অসভ্য পল্লীবাসিনী রমণীর হৃদয়ে যে এতটুকু করুণা, এতটুকু অতিথিবৎসলতা থাকিতে পারে, তাহা তিনি এই প্রথম দেখিলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার আহারেচ্ছা না থাকিলেও এই দয়াবতী রমণীর হৃদয়ে ক্ষোভ দেওয়া অসঙ্গত বিবেচনায় বলিলেন,—"খাইতে কি আছে?"

কেতকী বলিল,—"ভাত আছে।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া সাহেব বলিলেন,—"আমি কখনও ভাত খায় না।"

কেতকী বলিল,—"তবে গুড় আছে, মুড়ি আছে, কলা আছে।"

সাহেব গুড়মুড়ি খাইলেন না, কেবল কয়েকটা সুপক্ক কদলী উদরসাৎ করিলেন। কেতকীর অন্ন প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সে কিছুই খাইল না। আহারান্তে সাহেব বসিয়া বসিয়া কেতকীকে তাহার সংসারের কথা, অবস্থার কথা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কেতকী একে একে ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বলিল। তাহার সকল কথা না বুঝিলেও সাহেব ইহা বুঝিতে পারিলেন যে সে বিধবা, তাহার কেবল এক বৃদ্ধ শ্বশুর ভিন্ন আর কেহই নাই, অবস্থা বড় মন্দ।

রাত্রিশেষে বৃষ্টি থামিল। প্রভাতে উঠিয়া সাহেব বস্ত্র পরিবর্তন করিলেন, এবং পকেট হইতে একখান নোট বাহির করিয়া কেতকীর হাতে দিতে গেলেন। কিন্তু কেতকী তাহা লইল না। সাহেব অনেক অনুরোধ করায় সে বলিল,—"বিপদে মানুষকে আশ্রয় দিয়া কিছু লইতে নাই সাহেব।"

অসভ্য অশিক্ষিত নেটিভ-রমণীর হৃদয় এত উচ্চ, এত লোভশূন্য দেখিয়া সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি নোটখানি আপনার পকেটে রাখিয়া বলিলেন,—"তোমার নাম কি হয়?"

কেতকী নতবদনে আপনার নাম বলিল। সাহেব নোট বুকে নামটী লিখিয়া লইয়া বলিলেন,—"আমার নাম হয় জন হ্যারিংটন। কোন প্রয়োজন হইলে বা কোন বিপদে পড়িলে শ্যামগঞ্জের ছাউনীতে আমার নিকট যাইবে।"

ঘরের এদিকে ওদিকে একবার পাদচারণ করিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন। কেতকী তাঁহার সমস্ত নামটা মনে রাখিতে পারিল না, কেবল জন কথাটা মনে রহিল।

(৪)

প্রভাতে রামধনের গৃহ হইতে সাহেবকে বাহির হইতে দেখিয়া গ্রামের লোকেরা বিস্মিত হইল। তারপর যখন তাহারা অনুসন্ধানে জানিল যে, কল্য রাত্রিতে রামধন বাটীতে ছিল না, এবং সাহেবের সহিত কেতকী সমস্ত রাত্রি বাস করিয়াছে, তখন সকলেই অনায়াসে স্থির করিল যে, এত দিনের পর কেতকী মরিয়াছে, সে এখন সাহেবের অনুগৃহীতা হইয়াছে। ক্ষুদ্র গ্রামে কথাটা শীঘ্রই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। সহসা নবীন আন্দোলনের হিল্লোলে চিরনিস্তব্ধ গ্রামখানা যেন মুহূর্ত্তে সজীব হইয়া উঠিল।

একটু বেলা হইলে রামধন বাটীতে আসিল। কেতকী শ্বশুরের নিকট গতরাত্রির ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া রামধন তাহাতে একটুও অবিশ্বাস করিল না বা অসন্তুষ্ট

হইল না, বরং বিপন্নকে আশ্রয়দানের জন্য পুত্রবধূর প্রশংসা করিল।

কিন্তু বাটীর বাহির হইলেই অনেকে আসিয়া বৃদ্ধের নিকট কেতকীর দুশ্চরিত্রতার কথা প্রকাশ করিল। শুনিয়া রামধন জ্বলিয়া উঠিল, তাহাদিগকে দুই চারিটা কড়া কথা শুনাইয়া দিল। তাহারা বুঝিল, ভিতরে বুড়ারও যোগ আছে।

সেই দিনই গ্রামের মণ্ডল-শ্রীনাথ দাস, রামধনকে ডাকাইয়া বলিল,—"কেতকীকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দাও, নতুবা তোমার সহিত কেহ চলিব না।"

সতী সাবিত্রী পুত্রবধূর উপর অকারণ এই দোষারোপ বৃদ্ধের সহ্য হইল না। সে রাগের মাথায় মণ্ডলকে দুই চারিটা কড়া উত্তর শুনাইয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। ইহাতে সকলেই স্থির করিল, বুড়া শেষ বয়সে পুত্রবধূর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়াছে। সকলেই তাহার উপর চটিয়া গেল।

কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন কেতকীও তাহা শুনিল। সে বুঝিল, এরূপ অবস্থায় তাহার উপর লোকের সন্দেহ হওয়াই সম্ভব। ঘৃণায় লজ্জায়, অপমানে তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু বৃদ্ধ রামধনকে কাহার কাছে রাখিয়া সে

মরিবে ? সুতরাং কেতকীর মরা হইল না, সে কেবল কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রামধন বলিল,—"কান্না কিসের মা, লোকের কথায় কি আসে যায় ? 'মিথ্যা কথা সেঁচা পানি' কতক্ষণ থাকে ? ভগবানকে ডাক মা !"

সেই দিন রাত্রিকালে শ্বশুরের জন্য শয্যা পরিষ্কার করিতে গিয়া কেতকী দেখিল, শয্যার নীচে একটা আংটী। সে আংটীটা আনিয়া শ্বশুরকে দেখাইল। আলোকের নিকট গিয়া রামধন দেখিল, আংটীর মধ্যে একটা লাল পাথর, পাথরটা যেন জ্বলিতেছে। সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া রামধন বলিল,—"আংটীটা বোধ হয় দামী।"

কেতকী বুঝিল, ইহা সেই সাহেবেরই কাজ। সে বলিল, —"এটা নিশ্চয়ই সেই সাহেবের আংটী, বোধ হয় ফেলে গেছে। কাল তাহাকে দিয়া আইস।"

পরদিন রামধন আংটী লইয়া শ্যামগঞ্জের ছাউনিতে উপস্থিত হইল। হ্যারিংটন ছাউনীর বাহিরে বসিয়াছিলেন। তিনি রামধনের নিকট সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—"আমিই সেই সাহেব; কিন্তু এ আংটী আমার নহে। ইহা তোমাদের সাধুতার জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত পুরস্কার।"

রামধন তাঁহাকে আংটী ফিরাইয়া লইতে অনেক অনুরোধ করিল; কিন্তু সাহেব কিছুতেই তাহা আপনার বলিয়া স্বীকার

করিলেন না। অগত্যা রামধন ফিরিয়া আসিল। সাহেব এই দরিদ্র কৃষকের সততা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন।

(৫)

অপবাদটা মুখে মুখে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, এমন কি শেষে দেশে বাস করাও রামধনের দায় হইয়া পড়িল। কেহই তাহার সহিত কথা কহে না, দেখা হইলে মুখ বাঁকাইয়া, মুচ্‌কি হাসিয়া চলিয়া যায়। কেহ বা তাহার মুখের উপর দুই চারিটা তীব্র বিদ্রূপ বাক্যও শুনাইয়া দেয়, কখন বা ছেলের দল তাহার পশ্চাতে হাততালি দিয়া উঠে। ইহাতে বৃদ্ধ রামধন হৃদয়ে শেলাঘাতের নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করে।

অনেক চিন্তার পর রামধন দেশত্যাগ করাই স্থির করিল। কিন্তু অন্যত্র গিয়া নূতন করিয়া ঘর বাঁধিতে হইলে কিছু টাকার দরকার। তখন কেতকী সেই আংটীটা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রামধনও তাহাতে সায় দিল।

হাটের দিন রামধন হাটে যাইবার সময় আংটীটা সঙ্গে লইয়া গেল। সেখানে এক পোদ্দারের দোকানে আংটীটা দেখাইল। পোদ্দার রামধনের হস্তে এমন মূল্যবান আংটী দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে বুঝিল আংটীর পাথরখানার দাম দুই হাজার টাকার কম নহে। একজন সামান্য লোকের

নিকট এরূপ মূল্যবান আংটী দেখিয়া পোদ্দারের বড় সন্দেহ হইল। সে রামধনকে বসিতে বলিয়া গোপনে পুলীশে সংবাদ দিল। তৎক্ষণাৎ পুলীশ আসিয়া আংটীর সহিত রামধনকে গ্রেপ্তার করিল।

মধ্যাহ্নকালে দুই একজন লোক হাট হইতে ফিরিয়া এ সংবাদটা গ্রামে রাষ্ট্র করিয়া দিল। কেতকীও শুনিল, তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি উপায়ে শ্বশুরকে উদ্ধার করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। গ্রামের মধ্যে এমন কেহই নাই যাহাকে সে আপনার দুঃখের কথা বলে বা এ বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করে। কেতকী বড় অস্থির হইয়া পড়িল। সহসা তাহার মনে হইল, সেই সাহেব যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল, "কোন বিপদে পড়িলে শ্যামগঞ্জে আমার নিকট যাইবে।" সাহেব মনে করিলে কি না করিতে পারে? বিশেষতঃ সাহেব যদি আংটী নিজের বলিয়া স্বীকার করে, তবে তো সকল গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু কিরূপে সেখানে সংবাদ দেওয়া যায়? অনেক ভাবিয়া শেষে কেতকী সাহসে বুক বাঁধিল, নিজেই সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য শ্যামগঞ্জে চলিল।

তিন ক্রোশ পথ ভাঙ্গিয়া কেতকী অপরাহ্ন কালে শ্যামগঞ্জের ছাউনিতে উপস্থিত হইল। ছাউনীর বাহিরে একজন

লোক দাঁড়াইয়াছিল; কেতকী তাহাকে জন সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিল। লোকটি বলিল,—"এখানে জন নামে দুই জন সাহেব থাকেন; সাহেবের আর কোন নাম জান?"

কেতকী বলিল,—"ভুলিয়া গিয়াছি।"

লোক বলিল,—"কিন্তু জন নামে যে দুইজন সাহেব থাকেন, তাঁহাদের কেহই আজ এখানে নাই। এক জন চারিক্রোশ দূরে পলাশপুরে গিয়াছেন, সন্ধ্যার পর আসিবেন বোধ হয়; আর একজন গোপালনগরে আছেন।"

গোপালনগর সেখান হইতে এক ক্রোশ দূর; রাস্তা ভাল। কেতকী আর কোন কথা না বলিয়া গোপাল নগরে চলিল। যাইবার সময় লোকটি জিজ্ঞাসিল,—"তোমার নাম কি?"

কেতকী আপনার নাম বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

(৬)

সন্ধ্যার সময় কেতকী গোপাল নগরে উপস্থিত হইল এবং অনেক খুঁজিয়া মাঠের ধারে সাহেবের ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পাইল। বাঙ্গালার সম্মুখে একজন ভৃত্য বসিয়াছিল। কেতকী তাহাকে সাহেবের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, সাহেব বাঙ্গালার ভিতর আছেন। তখন সে ভৃত্যকে

অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সাহেবের সহিত দেখা করাইয়া দিতে বলিল। তাহার কাতরতা দর্শনে ভৃত্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাঙ্গালার ভিতর প্রবেশ করিল এবং অল্লক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া, কেতকীকে লইয়া সাহেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। একটী ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া সাহেব তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন। কেতকী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই চমকিয়া উঠিল। দেখিল এ তো সে সাহেব নয়, তাহার মুখখানা তো এমন বিশ্রী নহে? কেতকীকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিলেন। তাহার পর স্বাভাবিক রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি চাও টুমি?"

কেতকী কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"তুমি তো সে সাহেব নও?"

সাহেব বলিলেন,—"কাহাকে চাহ টুমি?"

কেতকী বলিল,—"আমি জন সাহেবকে খুঁজছি।"

সাহেব সহাস্যে বলিলেন,—"হামিও জন আছে, হামাড় নাম জন রবার্ট। কি কাজ আছে টোমাড়?"

কেতকী ভাবিল, সাহেব তো বটে? মনে করিল এ সাহেবও তো উপকার করিতে পারে। তখন সে আপনার বিপদের কথা সাহেবকে জানাইল। শুনিয়া সাহেব ঈষদ্ধাস্য-

পূর্ব্বক বলিলেন,—"Very good, হামি টাহার উপায় করিটে পারিবে। ডর করিও না টুমি, বহস।"

সাহেব নিকটস্থ শয্যা দেখাইয়া কেতকীকে তাহাতে বসিতে বলিলেন। আর অন্য আসন সেখানে ছিল না। কেতকী বলিল,—"না আমাকে এখনই যাইতে হইবে।"

সাহেব। রাত্রিকালে যাইতে পারিবে না টুমি, প্রাটে উঠিয়া যাইবে।"

কেতকী। আমার শ্বশুর বিপদাপন্ন।

সাহেব। D'not care, হামি টাহার ভাল করিবে।

সাহেব পকেট হইতে একটা চুরুট বাহির করিয়া তাহা ধরাইলেন। পরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,— "কল্য প্রাটে হামি পোলিসে লোক পাঠাইবে। ডরো মৎ বিবি।"

সাহেব কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। কেতকী কক্ষতলে বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ভৃত্য আসিয়া আলোক দিয়া গেল। কেতকী তাহাকে বলিল,—"আমি বাহিরে যাব।"

ভৃত্য বলিল,—"সাহেবের হুকুম না হইলে যাইতে পারিবে না।"

কেতকী জিজ্ঞাসিল,—"সাহেব কোথায় ?"

ভৃত্য কোন উত্তর দিল না, দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। কেতকী মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

এদিকে সন্ধ্যার পরই হ্যারিংটন সাহেব শ্যামগঞ্জের ছাউনীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিবা মাত্র পূর্ব্বোক্ত লোকটী তাঁহার নিকট কেতকীর আগমন সংবাদ জানাইল। সাহেব তাহাকে আগন্তুক স্ত্রীলোকের নাম জিজ্ঞাসিলেন। লোক বলিল,—"তাহার নাম কেতকী।"

সাহেব একবার নোটবুক খুলিয়া দেখিলেন; তারপর ব্যস্ততা সহ জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কোন্ দিকে গিয়াছে।"

লোক বলিল,—"গোপাল নগরে।"

সাহেব তৎক্ষণাৎ দুই জন ভৃত্যকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া দ্রুতপদে গোপাল নগর অভিমুখে চলিলেন।

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় সশব্দে দ্বার মুক্ত করিয়া রবার্ট সাহেব কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চরণদ্বয় ঈষৎ চঞ্চল, স্বরটা একটু জড়িত, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ। সাহেব আসিয়াই "O my dearling!" বলিয়া কেতকীকে ধরিতে গেলেন। কেতকী ব্যস্তভাবে উঠিয়া পশ্চাৎপদ হইল, সাহেব হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই তিনি দ্বিভুজ বাহু বিস্তার করিয়া কেতকীকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ

করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কেতকী চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে সহসা সশব্দে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল, এবং এক ব্যক্তি বিদ্যাদ্বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সাহেবের পৃষ্ঠে সবলে পদাঘাত করিলেন। সে আঘাতে সাহেব কয়েক হাত দূরে নিপতিত হইলেন। কেতকী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সে যাহাকে খুঁজিতেছিল, সম্মুখে সেই সাহেব। সে চীৎকার করিয়া সাহেবের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

(৭)

কেতকীর নিকট সমস্ত অবগত হইয়া সেই রাত্রিতেই হ্যারিংটন থানায় উপস্থিত হইলেন, এবং স্বয়ং জামিন হইয়া রামধনকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। দেশের লোকেরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইল; কেতকীর সহিত সাহেবের যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়াছে,তাহাতে তাহাদের আর কোনই সন্দেহ রহিল না। অপবাদটা আরও একটু বাড়িয়া উঠিল।

যথা সময়ে আদালতে মোকদ্দমা উঠিল। হ্যারিংটন আদালতে উপস্থিত হইয়া আংটী আপনার বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাহা তিনি পুরস্কার স্বরূপ রামধনকে দান করিয়াছিলেন, এ কথাও বলিলেন। মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইয়া গেল।

আদালতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেও কিন্তু রামধন

এবার কালের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না। তাহার শোকতাপজীর্ণ হৃদয়ে কেতকীর সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদটা বড়ই আঘাত করিয়াছিল, লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে তাহার বুকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর আবার চোর অপবাদে গ্রেপ্তার, পুলীশের হস্তে অযথা পীড়ন—বৃদ্ধের জীর্ণবুকে এত আঘাত আর সহিল না, সে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। তারপর একদিন পুত্রবধূর কোলে মাথা রাখিয়া হরিনাম করিতে করিতে বৃদ্ধ সকল জ্বালার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। দুর্গম সংসার-পথে কেতকী একা পড়িয়া রহিল।

কেতকী প্রথমে খুব কাঁদিল, তারপর চক্ষু মুছিয়া শ্বশুরের সৎকারের জন্য ব্যস্ত হইল। সে গ্রামের সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া মাথা কুটিল, কিন্তু কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। অধিকন্তু কেহ কেহ শ্লেষ করিয়া বলিল,—"ভাবনা কি, এখনই সাহেব এসে গোর দিবে।"

কেতকী অকূল-পাথারে পড়িল। কেবল একজন তাহার এই কাতরতা সহ্য করিতে পারিল না। বৃদ্ধ সদয় চাঁড়াল [illegible] গ্রামের লোকের মুণ্ডপাত করিতে করিতে কোমর বাঁধিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং ক্ষিপ্রহস্তে কতকগুলা কাঠ কাটিয়া চিতা সাজাইয়া দিল। কেতকীর দেহে যথেষ্ট

শক্তি ছিল; সে শ্বশুরের শবদেহ স্কন্ধে লইয়া শ্মশানে আসিল। তারপর সদয়ের উপদেশানুসারে অনেক কষ্টে দাহকার্য্য সম্পন্ন করিল। দাহশেষে স্নান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কেতকী একা শূন্য গৃহে প্রবেশ করিল।

(৮)

ইহার তিন দিবস পরে একদিন গভীর রজনীতে তেঁতুলবেড়ে গ্রামে একটা বড় গোল উঠিল। ভীষণ চীৎকার ধ্বনি, লাঠীর ঠক্‌ঠকি এবং দরজা ভাঙ্গার শব্দ শুনিয়া গ্রামবাসীরা বুঝিল, রামধনের ঘরে ডাকাত পড়িয়াছে। সকলে উত্তমরূপে স্ব স্ব গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল।

তারপর প্রভাতে উঠিয়া সকলে দেখিল যে, সত্য সত্যই রামধনের বাটীতে ডাকাইতি হইয়াছে। কিন্তু ঘরের জিনিষ পত্র সমস্তই রহিয়াছে, কেবল কেতকী নাই। সকলে সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল।

পুলিস আসিয়া যথারীতি ডাকাতির তদন্ত আরম্ভ করিল। কিন্তু তিন চারিদিন অতীত হইলেও ডাকাতির কোন কিনারাই হইল না, কেতকীরও কোনরূপ সন্ধান পাওয়া গেল না।

এই অদ্ভুত ডাকাতির সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। হ্যারিংটন সাহেব শ্যামগঞ্জে বসিয়াই এ সংবাদ শুনিলেন; শুনিয়াই তিনি তেঁতুলবেড়ের উপস্থিত হইলেন।

গ্রামের লোকের মুখে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে, মিঃ রবার্ট পদাঘাতের বেদনা ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু সে কথা প্রকাশ না করিয়া তিনি স্বয়ং গোপনে কেতকীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

তিনদিন অনুসন্ধানের পর সাহেব শুনিলেন যে,গোপাল-নগরের প্রান্তভাগে নদীতীরে ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে একটা অর্দ্ধভগ্ন মন্দির আছে, কেতকীকে সেই স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। শুনিবা মাত্র হ্যারিংটন লোকজন সহ সেই স্থানাভিমুখে ছুটিলেন।

অনেক অন্বেষণ করিয়া হ্যারিংটন মধ্যাহ্ন কালে সেই নদীতীরস্থ জঙ্গল ও মন্দির পাইলেন। তখন তিনি জঙ্গল ঠেলিয়া অনেক কষ্টে মন্দিরের সম্মুখে আসিলেন। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সেই মুক্ত দ্বারপথে সাহেব যাহা দেখি-লেন, তাহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, সেই মন্দিরের একদিকে ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া আড়ষ্ট ভাবে কেতকী দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সম্মুখে দুই তিন হাত দূরে রবার্ট সাহেব তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল হস্তে দণ্ডায়মান। রবার্ট বলিতেছে,—"হয় সম্মত হও, নতুবা এখনই গুলি করিব।"

হ্যারিংটন লাফাইয়া মন্দিরের দ্বার সমীপে উপস্থিত হই-

লেন। সে শব্দে চমকিত হইয়া রবার্ট একবার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। মুহূর্ত্ত পরেই তাহার হস্তস্থিত পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই হ্যারিংটন "O satan" বলিয়া লাফাইয়া উভয়ের মধ্যস্থলে পিস্তলের সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইলেন, গুলি তাঁহার স্কন্ধদেশ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। হ্যারিংটন সেই স্থানে লুটাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরগণ ছুটিয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ রবার্ট পিস্তল ঘুরাইয়া আপনার ললাট লক্ষ্য করিল। আবার ভীমশব্দে মন্দির, জঙ্গল প্রতিধ্বনিত করিয়া পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল, শব্দের সহিত রবার্টের প্রাণহীন দেহ হ্যারিংটনের পার্শ্বে পতিত হইল।

হ্যারিংটন তখনও সংজ্ঞাহীন। অনুচরগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ গোপালনগরের কুঠীতে লইয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া অস্ত্রপ্রয়োগে হ্যারিংটনের স্কন্ধ হইতে গুলি বাহির করিয়া দিলেন, ঔষধ দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ করিলেন। সন্ধ্যার পর হ্যারিংটনের চৈতন্য হইল। তিনি কেতকীকে দেখিতে চাহিলেন। কেতকী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সে তখন কাঁদিতেছিল, তাহার বক্ষ প্লাবিত করিয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটিতেছিল। সাহেবের চক্ষু

সজল। কেতকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"সাহেব, আমার জন্য তুমি প্রাণ দিলে?"

সাহেবের মুখে হাস্যরেখা বিভাসিত হইল, তিনি ক্ষীণ-স্বরে বলিলেন,—"আমি অতিশয় আনন্দিত হইব, যদি তোমার কথা সত্য হয়। তুমিই একদিন মৃত্যুর মুখ হইতে আমাকে বাঁচাইয়াছিলে।"

কেতকী বলিল,—"আমি তো বাঁচাই নাই সাহেব, আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করেছিলাম।"

হ্যারিংটন বলিলেন,—"তুমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিলে, কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্য পালন না করিয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমি জানিয়াছি, আমাকে আশ্রয় দিয়া তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমি তোমার কিছুই করিতে পারি নাই। ওঃ দয়াময় ঈশ্বর! কেবল প্রাণ দিয়া কি আমি তোমার নিকট মার্জ্জনা পাইব?"

হ্যারিংটন আর কিছু বলিতে পারিলেন না, তিনি আবার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। ক্ষতস্থান হইতে আবার রক্ত ছুটিতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন,—"বাঁচিবার আশা নাই।"

পরদিন মধ্যাহ্ন কালে হ্যারিংটনের আর একবার চৈতন্য

হইল। তিনি কেতকীকে ডাকিলেন। কেতকী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সম্মুখে আসিল। সাহেবের নিকট প্রায় দশহাজার টাকা ছিল; তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ কেতকীকে দান করিলেন, অপরার্দ্ধ ভৃত্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। তারপর যীশুর পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে হ্যারিংটন চিরনিদ্রিত হইলেন।

কেতকী সেই পাঁচ হাজার টাকা দিয়া মাঠের মধ্যে এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইল। দীর্ঘিকার নাম রাখিল সাহেবদিঘী। তারপর কেতকী কোথায় গেল, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু সেই বিশাল দীর্ঘিকা আজিও শত শত তৃষ্ণাতুর পথিককে সুশীতল বারিরাশি দান করিতে করিতে কৃতজ্ঞতার মহীয়সী কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

ঋণশোধ।

—:•:—

(১)

প্রভাতে ছোট চালাটীতে বসিয়া রহমত আলি তামাক টানিতে টানিতে গোসেবানিরত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁরে হান্‌ফে! রায়বেড়ের তিন বিঘের খড়গুলো কেটে আন্‌লে হয় না?"

হান্‌ফে ওরফে হানিফ জাব্‌না মাখিতে মাখিতে বলিল, "সে আর কেটে এনে কি হবে? গোরু ছেড়ে খাইয়ে দিলেই হবে।"

রহমত কিছু ভগ্নস্বরে বলিল, "তাইতো রে, তাতে কি কিছুই হবে না?"

হানিফ বলিল, "এক মুঠোও না বাপজি, এক মুঠোও না।"

রহমত আপন মনে তামাক টানিতে লাগিল। হানিফ বলদ দুইটী ও গাভীটীকে যথাস্থানে বাঁধিয়া বৎসটীকে এক-পাশে বাঁধিল; গোশালা হইতে এক ঝুড়ি গোবর বাহিরে ফেলিয়া, নিকটস্থ কলসীতে হাত ডুবাইয়া হাতটা ধুইয়া

ফেলিল। তারপর একটা খড়ের বিঁড়া টানিয়া লইয়া পিতার পাশে বসিল, এবং রহমতের হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া তাহাতে একটা টান দিয়া বলিল, "তাইতো বাপজি! বছর কাট্‌বে কিসে? কুড়ি বিঘে জমি চাষ, এক্ মুঠো ধান ঘরে ঢুক্‌লো না। খাব কি?"

রহমত বলিল, "খোদা জীব দিয়েছে আহার দেবে, তার জন্য ভাবি না। গতর আছে খেটে খাব। কিন্তু এখন পোষের কিস্তীর খাজনার কি হবে, তাই ভাবছি। দুদিন পাগ (পাইক) এসে ফিরে গেছে।"

হানিফ হুঁকাটা পিতার হাতে দিয়া বলিল, "দাশু মোড়-লের কাছে গেছলে?"

রহমত বলিল, "গেলে কি হবে রে, তার গেল বছরের সাড়ে ছ'গণ্ডা টাকা ধারি। আবার কি বলে হাত পাতি?"

হানিফ সগর্ব্বে বলিল, "কেন তার টাকা কি ডুবে যাবে? মাই বা ফসল তোলো, খেটে দেনাশোধ কোর্ব্বো।"

পুত্রের উৎসাহ বাক্যে বৃদ্ধ রহমতের হৃদয় একটু আশ্বস্ত হইল। সে একটু হাসিয়া বলিল, "তা বটে, কিন্তু মহাজন কি বিশ্বাসে দেয়?"

হানিফ বলিল, "কেন, না খানাতো আছে। [illegible] কাজে বাপ বেটায় খেটেও কি টাকা দিতে পারবো [illegible]

পিতাপুত্রের কথায় বাধা পড়িল। দুইজন পাইক—মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা—চৌদ্দপোয়া মাপের লাঠী ঘাড়ে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। একজন রহমতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সেখের পো! নায়েব মশায় ডাকছে।"

রহমত ভীত ভাবে বলিল, "নবু চাচা! কাল সকালে যা পারি নিয়ে তেনার সাথে দেখা কোর্ব্বো বোলো।"

নবু বলিল, "তা আমরা জানি না, নায়েব মশায়ের হুকুম, তোমাদের বাপ বেটাকে এখনি হাজির হতে হবে।"

রহমত পুত্রের মুখপানে চাহিল। হানিফ বলিল, "তা চল না বাপজি! নায়েব মশায়ের সাথে দেখা করে তেনাকে সব বুঝিয়ে বল্‌লে হবে।"

রহমত নায়েব মহাশয়কে বেশ চিনিত, তাঁহাকে বুঝাইলে যে কিছুই হইবে না তাহাও জানিত। সুতরাং সে ভয়ে ভয়ে কাছারীর দিকে চলিল। গোশালা হইতে একটা টিকটীকি টিক্‌টিক্ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। রহমত আল্লার নাম জপিতে জপিতে পাইকদ্বয়ের পশ্চাদ্‌গামী হইল।

(২)

গোপীবাজার নামক ক্ষুদ্র গ্রামখানি কংসাবতীর তীরের উপর অবস্থিত। সেই গ্রামে ঠিক নদীর তীরে রহমতের আসিয়া বাস। বাসগৃহখানি ক্ষুদ্র, সাদাসিধা রকমের। দুই-

খানি খড়ের ঘর, একখানি রাঁধিবার ক্ষুদ্র চালা, একপাশে একটী গোশালা। বাটীতে প্রাচীর নাই। উঠানে এক বৃহৎ তেঁতুল গাছ। পরিজনের মধ্যে তাহার স্ত্রী ও ষোড়শ-বর্ষীয় পুত্র হানিফ। গোশালায় দুইটি বলদ, একটি গাভী ও একটি বৎস। এই ক্ষুদ্র গৃহস্থালিটি লইয়া রহমত বেশ আনন্দের সহিত কাল কাটাইত। কুড়ি বিঘা জমি চাষ, তাহাতে যে ফসল পাইত, খাজানা খরচা বাদ দিয়াও তদ্দ্বারা সংবৎসর একরকমে কাটিয়া যাইত। ইহা ব্যতীত তাহার একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ছিল, তাহাতেও কিছু আয় হইত। সুতরাং তাহার উচ্চাশা-বিহীন বিলাসবাসনাবর্জ্জিত ক্ষুদ্র হৃদয়-খানি ইহাতেই বেশ সন্তুষ্ট ছিল; কোন দিনই তাহাতে একটুও অসন্তোষের রেখা পড়িত না।

কিন্তু গত বৎসর হইতে তাহার সময়টা মন্দ পড়িয়াছে। বিগত ভাদ্রে হঠাৎ কংসাবতীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার সমস্ত ফসল প'চিয়া গেল। পৌষ মাসে দাশু মণ্ডলের নিকট সাড়ে ছয়গণ্ডা টাকা ধার করিয়া জমিদারের খাজানা শোধ করিল। সমস্ত বৎসরটা বড় কষ্টে কাটিল। আবার বর্ষা আসিল। নবোৎসাহে বুক বাঁধিয়া পিতাপুত্রে আবার চাষ করিল; আবার শ্যামল শস্যশ্রেণী দূরবিস্তৃত মাঠে শ্যামসাগরের তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। কিন্তু আবার দেবতা বিরূপ হইলেন।

আশ্বিন মাসের প্রথম হইতে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি হইল না। মাঠের ধান্য মাঠে শুকাইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় নদীর জলে অনেক উপকার হইত, কিন্তু ভাদ্র মাস হইতে কংসাবতীও শুষ্কপ্রায়। রহমতের বুকটা দমিয়া গেল। বুঝিল, এবার আর রক্ষা নাই,—এ খোদার মার। বাস্তবিকই বুঝি রহমত এবার খোদার অভিশাপে পড়িল।

(৩)

রহমতের বাটীর অনতিদূরেই কাছারী বাড়ী। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে মাটীর উচ্চ প্রাচীর। মধ্যস্থলে এক সুদীর্ঘ হলগৃহ, ইঁটের দেয়াল, খড়ের ছাউনি। তাহার এক অংশে একখানি গৃহ, অন্য অংশে কাছারী। বিস্তৃত অঙ্গনের এক পার্শ্বে খানিকটা ঘেরা জায়গা, সেখানে কয়েক ঝাড় বেলফুলের গাছ, একটা চাঁপা গাছ, একটী কলমের আম গাছ। অপর একদিকে একটা লাউ গাছ বাঁশ বহিয়া প্রাচীরে উঠিতেছে। কাছারীর হলে উঠিবার ধাপ তিনটী বিলাতী মাটী দেওয়া; তাহার দুই পাশে দুইটী কামিনী ফুলের গাছ।

রহমত যখন কাছারীতে উপস্থিত হইল, তখন নায়েব মহাশয় একখানি জলচৌকিতে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতে-ছিলেন। নায়েব মহাশয়ের দেহটী বেশ স্থূল, কিন্তু যেরূপ স্থূল হইলে চলা ফেরা করিতে কষ্টবোধ হয়, সেরূপ স্থূল নহে।

তবে উদরের পরিমাণটা দেহের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরু। বর্ণ ঈষৎ শ্যাম। কণ্ঠদেশে ত্রিকণ্ঠী তুলসীর মালা। নাম শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, জাতিতে সদ্‌গোপ। ঘোষ মহাশয়ের বিদ্যাশিক্ষা কোথায় কতদূর হইয়াছিল, তাহার সন্ধান কেহ রাখে না, তবে তিনি যে খাজানা আদায়ে ও প্রজাশাসনে সিদ্ধহস্ত এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত। আর এই গুণেই জমিদারের নিকট তাঁহার সাত খুন মাপ হইত। তাঁহার অমোঘ প্রতাপে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়।

রহমত কাঁপিতে কাঁপিতে এহেন প্রবল-প্রতাপান্বিত নায়েব মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং ভূমি স্পর্শ করিয়া এক সুদীর্ঘ সেলাম করিল। নায়েব মহাশয় তাহার দিকে একবার বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র। রহমত পুত্রের সহিত উঠানের এক পাশে বসিল।

মুখপ্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ হইলে ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। নায়েব মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে রহমতের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "রহমত! গতিক খানা কি? রাজার খাজনা দিতে হবে বলে কি মনে নাই? খাজানা এনেছিস্?"

রহমতের মুখ শুকাইয়া গেল, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। দুই একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না। তখন নায়েব মহাশয় আবার মেঘমন্দ্র স্বরে বলিলেন, "কি গো নবাব সাহেব! গরীবের কথাটা কাণে গেল কি?"

রহমত দুই'একটা ঢোঁক গিলিয়া, দুই একবার কাসিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে হুজুর, আপনি গরীবের মা বাপ।"

নায়েব মহাশয় ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, গরীবের মা বাপ নয় তো কারে আর শূলে দিচ্ছি? এখন আসল কথাটার কি বল দেখি?"

রহমত বলিল, "হুজুর যদি মেহেরবানী করে এ কিস্তিটা রেহাই দেন, তবে আস্‌চে কিস্তীতে—"

বাধা দিয়া নায়েব বলিলেন, "আমার তো বাবার ধন নয় যে রেহাই দেব। আমি রেহাই দিলে জমিদার ছাড়বে কেন? আর জমিদার ছাড়লেও কোম্পানী ছাড়বে কেন?"

রহমত বলিল, "হুজুর মনে করলে সবই পারেন, আপনি আমাদের মাবাপ।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "ওসব তেল-মাখান কথা রাখ, খাজনা আজই চাই। ওরে নবা! আগে খাজনা আদায় করে তবে বাপ বেটাকে ছেড়ে দিবি।"

রহমত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "হুজুর! আপনি রাজা, রাখতেও পারেন মারতেও পারেন, হুজুর গরীবের ওপর জুলুম করলে—"

নায়েব মহাশয় সগর্জ্জে চৌকী হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "তবেরে বেটা নেড়ে! জুলুম? এখন আমি রাজা, মা বাপ, 'কন্ধ আমার মেয়ের বে'র সময় যখন পাঁচটী টাকা চাঁদা চেয়েছিলাম, তখন আমি ছিলাম জমিদারের চাকর!"

ইহার পর নায়েব মহাশয়ের মুখবিবর হইতে যে সকল রুচিসঙ্গত বাক্য বাহির হইতে লাগিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সুরুচিসম্পন্ন পাঠক পাঠিকাগণকে বিরক্ত করিতে চাহি না। এইরূপ কতকগুলা ভদ্রজনোচিত বাক্যোচ্চারণের পর নায়েব মহাশয় হুকুম দিলেন, "বেটা নেড়েদের বাপ বেটাকে খুঁটোতে বেঁধে পঞ্চাশ জুতো লাগাও।"

রহমত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া নায়েব মহাশয়ের পায়ে আছাড়িয়া পড়িল। নায়েব মহাশয় তাহার বক্ষে এমন এক পদাঘাত করিলেন যে, সে কয়েক হাত দূরে ঠিকরিয়া পড়িল।

হানিফ বসিয়া বসিয়া পিতার এইরূপ লাঞ্ছনা দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার বুকের রক্তটা গরম হইয়া

উঠিল। নিকটে জনৈক পাইকের একজোড়া নাগরা জুতা পড়িয়াছিল। সে ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, তাহারই একটা নায়েব মহাশয়ের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িল। সৌভাগ্য ক্রমে তাহা নায়েব মহাশয়ের মস্তকে না লাগিয়া স্কন্ধদেশে আঘাত করিল। জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল। নায়েব মহাশয় হুকুম দিলেন, ছোঁড়াকে ঘরের ভিতর লইয়া যাও। পাইকগণ হানিফকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। রহমত অনেক কাঁদিল, অনেক কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু তাহাতে নায়েব মহাশয়ের হৃদয় গলিল না। আরও কয়েক জন পাইক রহমতকে ধরিয়া একদিকে লইয়া গেল।

ওদিকে ঘরের ভিতর পাইকগণ হানিফকে রীতিমত শিক্ষা দিতে লাগিল। নায়েব মহাশয়ও স্বয়ং একবার গিয়া কিছু শিক্ষা দিয়া আসিলেন।

(৪)

এদিকে নায়েব মহাশয় যখন পিতা পুত্রকে শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন গ্রামবাসীরা সভয়ে দেখিল, রহমতের গৃহ হইতে অগ্নির করাল জিহ্বা উঠিয়া মধ্যাহ্ন গগন আচ্ছন্ন করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আসিয়া সেখানে সমবেত হইল। কিন্তু কি জানি, কাহার ইঙ্গিতে কেহই সে অগ্নি নির্বাণ করিতে চেষ্টিত হইল না। রহমতের স্ত্রী গৃহ হইতে

বাহির হইতে পারে নাই ; ভীষণ অগ্নিস্তূপের মধ্য হইতে তাহার করুণ ক্রন্দন উঠিয়া দর্শকবৃন্দকে অস্থির করিয়া তুলিল, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাহার উদ্ধারে অগ্রসর হইল না। সকলেই নীরবে সেই ভীষণ অগ্নিক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিল। হতভাগিনী রহমতের স্ত্রী জীবন্তে দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় সেই ভিড়ের মধ্য হইতে জনৈক বলিষ্ঠ যুবক কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সেই প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার চতুর্দ্দিকে হুতাশনের লেলিহ-মান জিহ্বা নৃত্য করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে যুবক রহমতের স্ত্রীকে অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় বাহিরে আনিল। দেখিতে দেখিতে রহমতের গৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

নায়েব মহাশয়ের আদেশানুসারেই যে এই গৃহদাহের ব্যাপারটা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। কিন্তু সে কথাটা মুখ ফুটিয়া কেহই বলিতে পারিল না।

অপরাহ্নে রহমত যখন পুত্রকে লইয়া গৃহে ফিরিল, তখন হানিফ অচৈতন্য, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত। রহমত পুত্রের অচেতন দেহ বক্ষে লইয়া ভস্মস্তূপের নিকট দাঁড়াইল, বৃক্ষতলশায়িতা অর্দ্ধদগ্ধা স্ত্রীর যন্ত্রণা-কাতর মুখের পানে চাহিল, দুর্ব্বলের উপর প্রবল কত অত্যাচার করিতে

পারে, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। ক্রোধে, ক্ষোভে, শোকে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু সে একটুও কাঁদিল না, স্ত্রীর পার্শ্বে পুত্রকে শয়ন করাইয়া ডাক্তার আনিতে চলিল।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার আসিলেন। হানিফের অবস্থা দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। তারপর রহমতের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া পুলীশে সংবাদ দিতে বলিলেন। ডাক্তার বাবু এই গ্রামবাসী হইলেও এতাবৎ কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মেডিকেল কলেজেই অতিবাহিত করিয়াছেন। সুতরাং নায়েবের অখণ্ড প্রতাপ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। এই জন্যই তিনি মধ্যাহ্নকালে অগ্নিস্তূপ হইতে রহমতের স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে এবং এক্ষণে নায়েবের বিরুদ্ধে নালিস করিবার পরামর্শ দিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কিন্তু রহমত জানিত যে, পুলীশে সংবাদ দেওয়া বৃথা, পুলীশ তো নায়েবের দক্ষিণ হস্ত। এমন কি, নিম্ন আদালতেও তাঁহার অপরাধের বিচার হইবে না। তাই সে ডাক্তারের কথায় একবার উর্দ্ধে চাহিল। বুঝি, পৃথিবীর উপরে যে আদালত, যেখানে রাজা প্রজায় ভেদ নাই, যেখানে নায়েব রহমত উভয়েই সমান, সেই আদালতে প্রাণের অব্যক্ত কাতরতা জানাইয়া সে বিচারপ্রার্থী হইল। কিন্তু সে উচ্চ আদালতে দরিদ্র রহমতের নীরব অভিযোগ পৌঁছিল কি?

যথারীতি চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু হানিফের আর চেতনা হইল না। ইহার উপর প্রবল জ্বর আসিল। ডাক্তার আশা ত্যাগ করিলেন। দ্বিতীয় দিবসের রাত্রে হানিফের একবার চৈতন্য হইল। একবার অতি কষ্টে ক্ষীণ স্বরে বলিল, "বাপজি, বড় মেরেছে, এর শোধ চাই।" ইহার পর তাহার বাক্‌শক্তি চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইল, ক্ষণদীপ্ত চৈতন্যালোক চিরকালের মত নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। রহমতের স্ত্রী রোগশয্যায় পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু রহমত কাঁদিল না। তাহার কর্ণে তখনও পুত্রের শেষ উক্তি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, "এর শোধ চাই।" রহমতও মৃত পুত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এর শোধ চাই।" তাহার বিকৃত কণ্ঠধ্বনি ভিত্তি-গাত্রে প্রহত হইয়া বজ্রনাদে প্রতিধ্বনি করিল, "চাই"!

(৫)

রহমতের গৃহ শূন্য। হানিফের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে রহমতের স্ত্রীও পুত্রের অনুসরণ করিল। কয়েকদিন দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পুত্রশোকাতুরা জননীর প্রাণ পুত্রের উদ্দেশে ধাবিত হইল; পুত্রের কবরপার্শ্বে শয়ন করিয়া অভাগিনী বুঝি কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল। সংসার-পথে রহমত একা পড়িয়া রহিল। তাহার সুখময় গৃহ শ্মশান

হইল। কাঠুরিয়ার নির্ম্মম কুঠারাঘাতে পুষ্প পত্র শাখা একে একে সব ছিন্ন হইল, ছিন্নকন্ধর শুষ্কদেহ বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় এই বিশাল সংসার-প্রান্তরে রহমত একা কেবল অতী-তের সাক্ষীস্বরূপে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনের সকল সুখ, সকল আশা, সকল উদ্যম হারাইয়া কেবল কঠোর বর্ত্তমানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই দুর্ব্বহ জীবনভার বহনে প্রস্তুত হইল।

রহমত এখন আর কাহারও সহিত কথা কহে না। সে এখন নীরব ভস্মস্তূপের উপর বসিয়া কেবল ভাবে। ভাবিতে ভাবিতে নেত্রপ্রান্ত হইতে কয়েকবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়ে, হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হয়, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করে। তারপর সে বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলায়।

অনেক নীরব মধ্যাহ্নে, স্তব্ধ সন্ধ্যায় সে নদীতীরে একা বসিয়া থাকিত। বসিয়া বসিয়া দেখিত, জগৎ যেমন চলিত, তেমনই চলিতেছে। কংসাবতী তেমনই হেলিয়া দুলিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া কল কল রবে ছুটিতেছে, তেমনই তাহার তরঙ্গায়িত বক্ষ ভেদ করিয়া নৌকা সকল নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে,সম্মুখের তেঁতুল গাছের উঁচু ডালে বসিয়া পাখিগুলি তেমনই ডাকিতেছে, দিনের পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর রাত্রি সেই মত আসিতেছে, আবার যাইতেছে। প্রভাতে অপ-

রাহেং নায়েব মহাশয় তেমনই ছড়ি ঘুরাইয়া নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছেন। সংসারে সব সমান চলিতেছে, কেবল তাহারই দিনগুলা উলটাইয়া গিয়াছে। তাহার জীবন-ঘড়ির কাঁটাটা ঠিক চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন কোন্ আঘাতে কোন্ দিকে ঘুরিয়া পড়িয়াছে, তাহার অদৃষ্টের সূক্ষ্ম সূত্রটা সহসা কাহার হস্তে পড়িয়া গোলমাল হইয়া গিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার বুকের শিরাগুলা টন্ টন্ করিয়া উঠিত, তাহার উদাস হৃদয়খানা কংসাবতীর শীতল জলতলে শয়ন করিয়া জুড়াইবার নিমিত্ত অস্থির হইত; কিন্তু অমনই কোথা হইতে একটা মর্ম্মভেদী সকরুণ স্বর তাহার কাণে বাজিত, "এর শোধ চাই, এর শোধ চাই!" সহসা তাহার সম্মুখে অতীতের স্মৃতির একখান চিত্র ফুটিয়া উঠিত। সে দেখিত, তাহার সম্মুখে মৃত্যুশয্যায় শুইয়া হানিফ যেন তেমনই ক্ষীণ স্বরে বলিতেছে, "বাপজি! বড় মেরেছে, এর শোধ চাই!" প্রিয়-পুত্রের মৃত্যুর করালছায়া-ব্যাপ্ত মুখখানি অতীতের অন্ধকার ঠেলিয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিত, স্ত্রীর উচ্চ হাহাকার শুনিতে পাইত, তাহার অন্তিম শয্যা মনে পড়িত। অমনই রহমত উঠিয়া দাঁড়াইত, তাহার বৃদ্ধ হৃদয়ের শীতল রক্তস্রোত উত্তপ্ত হইয়া শিরায় শিরায় ছুটিত, নয়নে প্রতিহিংসা-বহ্নি ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিত। সে উন্মাদের [illegible] শূন্য গৃহপানে

ছুটিত। যুক্ত বায়ু তাহার পশ্চাতে হো হো শব্দে উপহাসের অট্টহাস হাসিয়া উঠিত।

(৬)

তুমি সুখেই থাক আর দুঃখেই থাক, দিন চলিয়া যাইবে। অনন্ত কালস্রোত অনন্ত হইতে আসিতেছে, অনন্তে মিশিতেছে। সে অবাধ স্রোতে সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, আনন্দ নিরানন্দ সকলই ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া যাইতেছে; স্রোতের নিবৃত্তি নাই। সে অনন্ত কাল হইতে আপন মনে তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে, এবং যাইবে। কোন বাধা মানিবে না, কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিবে না। সে স্রোতে এক একটী বুদ্বুদ উঠিয়া কত সংসার গড়িতেছে, আবার স্রোতের বুদ্বুদ স্রোতে মিশাইয়া কত সংসার ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু স্রোতের গতির বিরাম নাই। নাই বলিয়া তুমি সুখী, তোমারও দিন কাটে, আর আমি দুঃখী, আমারও দিন কাটে। তাই অতি দুঃখী রহমতেরও দিন কাটিতে লাগিল। দুই এক দিন নয়—দেখিতে দেখিতে দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল। হৃদয়ে প্রতিহিংসার অনন্ত-বহ্নি জাগাইয়া রহমত দুইটী বৎসর কাটাইল, কিন্তু প্রতিহিংসা-সাধন তো হইল না।

কতদিন সে বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছে; নায়েবের উষ্ণ-রক্তে হৃদয়ের [illegible] অগ্নি নির্বাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে,

ভৈরব ঘোষের জীবন দিয়া হানিফের অন্তিম আকাঙ্ক্ষা—শেষ ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু পারে নাই, হৃদয় অগ্রসর হয় নাই। কতদিন প্রভাতে সে তাহার নিরানন্দময় দগ্ধ গৃহদ্বারে বসিয়া দেখিয়াছে, নায়েব মহাশয় গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া সদর্প পদক্ষেপে নদীতীর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে তাহার সম্মুখে পদচারণ করিতেছেন; দেখিয়া তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার দারুণ পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে, পুত্রশোকের প্রবল বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া হৃদয়কে উন্মাদ করিয়াছে; অমনই তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি ভিত্তিগাত্রে দণ্ডায়মান সুপক্ক দীর্ঘ বংশযষ্টির উপর পতিত হইয়াছে। ইচ্ছা—তাহার এক আঘাতেই নায়েব মহাশয়ের নায়েবী জীবন শেষ করিয়া দেয়। কিন্তু পারে নাই, তাহার হৃদয়ের [illegible] হৃদয়েই বিলীন হয়। কোন এক অজ্ঞাত মন্ত্রশক্তি [illegible] তাহার হৃদয়কে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; হাত উঠে [illegible], পা অগ্রসর হয় না, সে কেবল মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের [illegible] অন্তরে অন্তরে গর্জ্জিতে থাকে, ভীষণ যন্ত্রণায় [illegible] হইয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরে।

একদিন রহমত দেখিল, নায়েব মহাশয়ের [illegible] পুত্র নির্জ্জন নদীঘাটে একা স্নান করিতেছে। স্নান করিতে করিতে বালক সাঁতরাইতেছে, ডুবিতেছে, উঠিতেছে,

আবার সাঁতরাইয়া দূরে যাইতেছে। রহমত দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইহা দেখিল, ভাবিল, এইতো অবসর, হানিফের ঋণশোধের এইতো শুভ সুযোগ, পাপিষ্ঠ ভৈরব ঘোষকে শাস্তি দিবার এইতো উত্তম সময়। রহমত দুইপদ অগ্রসর হইল, একবার দাঁড়াইল, একবার জলক্রীড়ানিরত বালকের পানে চাহিল, তারপর বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের পানে ছুটিল। হায় পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ!

৭)

বর্ষাকাল। গতরাত্রিতে নদীতে বাণ পড়িয়াছে। কংসাবতী কূলে কূলে পূরিয়া উঠিয়াছে, প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তীরে আঘাত করিতেছে। বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়া শরবণের উপর দিয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে প্রখর স্রোত চলিয়াছে, জল তীরের মত ছুটিয়াছে। সে স্রোতে কুটা পড়িলে ছিঁড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে আবর্ত উঠিতেছে, জল ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, ফিরিয়া আবার ছুটিতেছে, তাহাতে রাশি রাশি ফেনা উঠিতেছে। উন্মাদিনীর ন্যায় কংসাবতী ফুলিয়া ফুলিয়া ছুটিয়াছে। পারাপার বন্ধ। মাঝিরা মোটা মোটা কাছিতে অশ্বত্থগাছে নৌকা বাঁধিয়া বসিয়া আছে।

প্রাতঃকাল হইতে রহমত নদীতীরে বসিয়া কংসাবতীর

এই উন্মাদ নৃত্য দেখিতেছে। নিকটেই তাহার ভগ্নপ্রায় নৌকাখানা পড়িয়া রহিয়াছে। এতদিন একবারের জন্যও রহমত তাহার দিকে চাহিয়া দেখে নাই। কিন্তু আজ দেখিল, কংসাবতীর খরস্রোত সেই নৌকা খানাকে বেড়িয়া দুই পাশ দিয়া ছুটিতেছে। তাহাতে একটা অবিশ্রান্ত কল কল ধ্বনি উঠিতেছে। তরঙ্গাঘাতে নৌকাখানা এক একবার নড়িতেছে, বুঝি অতীতের একটা স্মৃতি আসিয়া অচেতন নৌকাকেও বিচলিত করিতেছে। রহমত বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল; একটা কঠোর স্মৃতির আঘাতে তাহার উদাস হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। সে কতদিন কংসাবতীর যৌবনের এইরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে। এইরূপ সময়ে কতদিন সে হানিফের সহিত এই ক্ষুদ্র নৌকাখানিতে বসিয়া কংসাবতীর তরঙ্গময় বক্ষে নৃত্য করিয়াছে। কতদিন খরস্রোতে তাহাদের নৌকাখানা বহুদূরে ভাসিয়া গিয়াছে, আবর্ত্তে পড়িয়া ডুবু ডুবু হইয়াছে, ভয়ে হানিফ পিতাকে নৌকা ফিরাইতে বলিয়াছে, কিন্তু রহমত নৌকা ফিরায় নাই। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবর্ত্ত হইতে আবর্ত্তান্তরে পড়িয়াছে, তাহার উপরে জল উঠিয়াছে, আতঙ্কে হানিফ দুই হাতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে; অমনই রহমত হাসিয়া সুকৌশলে নৌকাকে তীরসংলগ্ন করিয়াছে।

তখন হানিফ হাসিতে হাসিতে আবার গিয়া দাঁড় ধরিয়াছে। আজিও সম্মুখে সেই কংসাবতী, সেই মত্ত তাহার উদ্দাম নৃত্য, সম্মুখে সেই নৌকা, বসিয়া সেই রহমত, কিন্তু আজ হানিফ কোথায়? সে হানিফ আর নাই, হৃদয়ে আর সে সাহস নাই; নৌকা এখন ভগ্ন, গৃহ এখন শূন্য, সংসার এখন অন্ধকার। সবই আছে কিন্তু রহমতের সম্মুখে আজি ঘোর অন্ধকার। সে অন্ধকারের একটা কঠোর পেষণে তাহার বুকের হাড়গুলা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

(৮)

রহমত যেখানে বসিয়াছিল, তাহার অনতিদূরেই পার ঘাট। নায়েব মহাশয় পুত্রের সহিত সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে দুইজন পাইক, পাঁচ ছয় জন অনুগত প্রজা। নায়েব মহাশয়ের গৃহিণীর পীড়া, এই সংবাদ লইয়া কল্য তাঁহার মধ্যম পুত্র তাঁহাকে লইতে আসিয়াছে। এজন্য অদ্য তিনি বাটী গমন করিতেছেন। নদীতে বাণ আসিয়াছে ইহা তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এই সামান্য কারণে গৃহিণীর পীড়ার সংবাদকে উপেক্ষা করিতে তাঁহার সাহস হইল না। বিশেষতঃ তিন চারিদিনের মধ্যে বাণের তেজ কমিবে না ইহা তিনি জানিতেন। অগত্যা তাঁহাকে নিজ জীবনের উপর একটু আশঙ্কা সত্বেও যাত্রা করিতে হইল।

নদীর বাণ দেখিতে গ্রামের অনেক লোক তথায় সমবেত হইয়াছিল। নায়েব মহাশয়কে দেখিয়াই তাহারা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। দিনু মাঝি শক্ত কাছিতে খেয়া নৌকাটীকে বেশ করিয়া বাঁধিয়া, নিকটে হারুমুদীর দোকানের রোয়াকে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, এবং তৎপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন লোকের নিকট গত বৎসর এইরূপ বাণের মুখে কিরূপ সাহসের সহিত সে একনৌকা আরোহীকে পার করিয়া মাঝিগিরির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল, তাহারই গল্প বলিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেছিল। সহসা নায়েব মহাশয়ের শুভাগমন দেখিয়া সে ব্যস্তে হুঁকা ফেলিয়া উঠিল, উঠিয়া নায়েব মহাশয়কে একটা প্রণাম ঠুকিল। নায়েব মহাশয় তাহাকে শীঘ্র পার করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। দিনু একবার মুখ সিটকাইয়া নায়েব মহাশয়ের হুকুম তামিলের জন্য প্রস্তুত হইল। অন্য কেহ হইলে সে আজ নৌকার কাছি কখনই খুলিত না, কিন্তু নায়েব মহাশয়ের হুকুম অমান্য করে কাহার সাধ্য। অগত্যা সে নৌকাটীকে টানিয়া আনিল; নিজে গিয়া হালে বসিল তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরি আসিয়া দাঁড় ধরিল; কিন্তু সে একবারে সকলকে পার করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। কাজেই প্রথমে নায়েব মহাশয়ের পুত্র ও একজন পাইক নৌকায় উঠিল। নায়েব মহাশয় সেইখানে হারুমুদীর

আনীত একটা কেরোসীনের বাক্সের উপর বসিয়া নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দিনু একবার দরিয়ার পাঁচ পীরকে ডাকিয়া গঙ্গাদেবীকে স্মরণ করিতে করিতে নৌকা খুলিয়া দিল। স্রোতের টানে নৌকা ভাসিয়া চলিল; রহমত কঠোর দৃষ্টিতে নৌকার দিকে চাহিয়া রহিল।

স্রোতের বেগে হেলিয়া দুলিয়া নৌকা চলিল। তাহার দুইপাশ দিয়া খল্ খল্ ছল্ ছল্ শব্দে জল ভাঙ্গিতে লাগিল। দিনু শক্ত করিয়া হাল ধরিল, হরি প্রাণপণে দাঁড় বাহিতে লাগিল। সম্মুখেই একটা ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্ত। দিনু অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু রাখিতে পারিল না, নৌকা বেগে গিয়া সেই আবর্ত্তে পড়িল। তীর হইতে সামাল্ সামাল্ শব্দ উঠিল। দিনু সবলে হাল চাপিয়া ধরিল। অমনই কট্ কট্ কট্ শব্দে হালের দড়ি কাটিয়া গেল, নৌকা একপাক ঘুরিয়া পড়িল। তারপর পাগলের মত নাচিয়া নাচিয়া নৌকাখানা স্রোতের মুখে তীরবেগে ছুটিল। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল। নিকটেই একটা অর্দ্ধমগ্ন তালবৃক্ষ দাঁড়াইয়া ছিল। নৌকা বেগে গিয়া তাহাতে প্রহত হইল, একবার এপাশে একবার ওপাশে হেলিয়া নৌকা ডুবিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে পুত্রের রক্ষার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন,

পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন, কিন্তু কেহই অর্থ-লোভে কংসাবতীর সেই খর স্রোতে নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইল না। দেখিতে দেখিতে নৌকা ডুবিয়া গেল। দাঁড়ী মাঝি পাইক সন্তরণ-কৌশলে স্রোতে ভাসিয়া চলিল, নায়েব মহাশয়ের পুত্র নৌকার সহিত ডুবিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় মাটীতে আছড়াইয়া পড়িলেন।

যেখানে রহমত বসিয়াছিল, তাহার ঠিক সম্মুখেই নৌকা খানা ডুবিল। রহমত দেখিল, নৌকা নায়েব মহাশয়ের পুত্রের সহিত ডুবিয়া গেল। অমনই সে "হা আল্লা" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর দ্রুতপদে গিয়া জলে পড়িল। কিন্তু কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

কিছুক্ষণ পরে ঘাট হইতে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, যেখানে নৌকা ডুবিয়াছিল তাহার কিয়দ্দূরে দুইটা মাথা ভাসিয়া উঠিয়াছে। সকলে সোৎসুক দৃষ্টিতে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে মাথা দুইটা তীরের নিকটবর্ত্তী হইল। নায়েব মহাশয় সেই দিকে ছুটিলেন, জনমণ্ডলীও আনন্দধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ চলিল।

নিকটে গিয়া নায়েব মহাশয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন, তাঁহার পুত্রের উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহ নহে—রহমত। যাঁহারই অত্যাচার প্রপীড়িত তাঁহারই হৃদয়হীন কঠোর

পীড়নে পুত্রহীন গৃহহীন রহমত তাহার পুত্রের অচেতন দেহ বক্ষে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ শত্রুতনয়ের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জন করিয়া নদীর খরস্রোতে ঝাঁপ দিয়াছে। নায়েব মহাশয়ের হৃদয়ে এককালে শত বৃশ্চিকের দংশনযাতনা উপস্থিত হইল, কে যেন একটা তীক্ষ্ণাগ্র শেল লইয়া তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। রহমত তাঁহার পুত্রের অচেনতপ্রায় দেহ ধীরে ধীরে তাঁহার পদতলে রাখিল, তাহার পর চীৎকার করিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "আজ আমার ছানিকের ঋণশোধ!" সঙ্গে সঙ্গে কংসাবতীও প্রতিধ্বনি তুলিয়া যেন উত্তর দিল, "শোধ"; সে উত্তর নায়েব মহাশয়ের হৃদয়ে এককালে শত বজ্রের আঘাত করিল।

নায়েব মহাশয়ের পুত্র রক্ষা পাইল। কিন্তু সেই দিন হইতে রহমতকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

তাহার পর হইতে যখনই কংসাবতীতে বান আসিত, তখনই নায়েব মহাশয় শুনিতেন, যেন তাহার প্রখর প্রবাহ হইতে ভীমনাদে প্রতিধ্বনি উঠিতেছে, "শোধ!" যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন মাঝে মাঝে এই ধ্বনি শুনিতেন, শুনিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেন।

সম্পূর্ণ।